শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শক্তিকে রাজা ও ঋষি দুই-এর মিলিত সত্তায় ন্যস্ত করার ওপর জোর দিয়েছেন। ৪র্থ অধ্যায়ে তিনি বলেছেন–

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ ॥(৪/১)

শ্রীভগবান বললেন– আমি এই অক্ষয় যোগ বিবস্বানকে; বিবস্বান মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে এই যোগের কথা বলেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– এই যোগ, অর্থাৎ এই যোগের দার্শনিকতত্ত্ব আমি বিবস্বানকে উপদেশ দিয়েছিলাম। বিবস্বান এ বিষয়ে মনুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন; মনু ইক্ষ্বাকুকে শিখিয়েছিলেন। এখানে মনু ও ইক্ষ্বাকু উভয়কেই রাজর্ষি (রাজা ও ঋষি) হিসেবে ধরা হয়েছে। যাঁরা ছিলেন বাহিরে রাজা, অন্তরে ঋষি। কেবল রাজা হয়ো না, কেবল ঋষি হয়ো না, দুই-এর মিলন ঘটাও একের মধ্যে। তোমার ক্ষমতা আছে; তাকে একটু আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে শোধন করে নাও। এই শোধিত ক্ষমতাই এখন দরকার। যখন এই আধ্যাত্মিক শক্তির সংস্পর্শে ঐ ক্ষমতাধারীর ক্ষমতা শোধিত হয়, তখন শাসন ব্যবস্থা বিনা বাধায় চলতে থাকে; ফলে কোনরকম ক্ষতিকর সম্ভাবনা থাকে না। ভ্রষ্টাচার, সামাজিক কুপ্রথা, অপরাধ প্রবণতার বৃদ্ধি– আসে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির অভাব থেকে। ঐ আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির সামান্যও যথেষ্ট। অন্য কোন উপায়ে এর নিরাময় সম্ভব নয়; আইন প্রণয়নে বা সংসদীয় বিধিবিধানের অনুমোদনে, কোন মানুষের আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। মানুষ যখন আপন চেষ্টায় তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহার করতে শেখে তখনই তার মধ্যে এই সমৃদ্ধির সূচনা দেখা যায়। অত্যন্ত সাধারণ লোকের মধ্যে মহত্ত্ব আরোপ করতে হলে সেইরকম ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যার মধ্যে রাজা ও ঋষির মিলন ঘটেছে। আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া না লাগলে ঐ ব্যক্তিত্ব কখনই স্ফুরিত হয় না। যেখানেই এই রকম ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটেছে, তাঁদের আধ্যাত্মিক গুণাবলি অন্য লোককে তাঁদের কাছে আকর্ষণ করেছে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অবতারণা করেছিলেন রাজর্ষি ভাবের– যাতে নর-নারী রাজনীতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক বা অন্যান্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েও সেগুলিকে সে কেবল জনকল্যাণেই ব্যবহার করে। এই রকম ব্যক্তিই একদিকে ক্ষমতা ও অন্যদিকে অন্তরের আধ্যাত্মিক উন্নতির মিলন ঘটাতে পেরেছেন। এই ভাবটি হলো আধ্যাত্মিক উন্নতির। এটি হলো 'অহং' বোধের বিস্তার ঘটানো-যাতে 'তুমি' ও অন্য সকলের স্থান করে দেওয়া। তাকেই আধ্যাত্মিক উন্নতি বলা হয়, যা থেকে সবরকম মূল্যবোধজনিত দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম-মানবিকতা, সেবাবোধ, উৎসর্গীকৃত জীবনবোধ ইত্যাদি এসে থাকে। বেদান্তমতে সব মূল্যবোধই আধ্যাত্মিক এবং তার উৎস হলো প্রত্যেকটি জীবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব। সকলকে ভালোবাসতে ও কল্যাণ চিন্তা করতে থাক; সেবার ভাবে কাজ কর। তা করলেই তুমি আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির পথে এসে গেছো। এই রকম আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ লোকের হাতেই ক্ষমতা থাকা উচিত– রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা, আর্থিক ক্ষমতা। তারা যখন ক্ষমতার ব্যবহার করবে, সকলের উপকারই তারা করবে। সমাজ সুখী হবে, মানবিক উন্নয়ন হতে থাকবে, সমাজে শান্তি ও সমন্বয় বিরাজ করবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন "জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হলো– চরিত্র।" ঐ চরিত্র হলো আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির ফল, আধ্যাত্মিক বিকাশ। এই আধ্যাত্মিক বিকাশ, কোন মতে বিশ্বাসী, মতানুযায়ী, ধর্ম নয়; এ হলো আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি যার পরিণামে মূল্যবোধমুখী জীবন সূচিত হয়। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছেন–

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥(৩/৩৬)

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন– তবে, হে কৃষ্ণ মানুষ কীরূপ প্ররোচনায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন কোন বলের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে, অপরাধমূলক কাজে প্রবৃত্ত হয়?

এই প্রশ্ন প্রতিটি মানুষের মনের নিভৃতে যখন তখন জেগে ওঠে। অর্জুন মানবজাতির একজন প্রতিভূ মাত্র। অর্জুন বললেন, মানুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কীরূপ প্ররোচনায় বা কোন্ শক্তির দ্বারা নিয়োজিত হয়ে অপরাধমূলক কাজ করে? কেন মানুষ অপরাধ বা মন্দ কাজ করে থাকে? হিংস্র রক্তপাত, খুন, ডাকাতি; বস্তুত আজকাল নানা রকমের অপরাধ দেখা যায়, প্রতিদিনই তা বেড়ে চলেছে। তাই, জানা দরকার– এ অপরাধের উৎস কোথায়, কীভাবেই বা একে সমাজ থেকে নির্মূল করা যায়। গীতা, এ বিষয়ে– মানব সম্ভাবনা বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানব-ব্যক্তিত্বের গভীর-মাত্রার বৈদান্তিক পর্যালোচনাভিত্তিক এক অন্তর্দৃষ্টি আমাদের কাছে উপস্থাপন করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবান্ অপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥(৩/৩৩)

জ্ঞানী ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কাজ করে থাকেন; প্রাণিগণ স্ব স্ব প্রকৃতিকে অনুসরণ করে; সুতরাং তাকে দমনের চেষ্টায় বা বিধি-নিষেধে কী ফল হবে?

প্রকৃতি কথাটি কয়েকটি শ্লোকেই ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষে মানুষে আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য এবং আধ্যাত্মিকতার পার্থক্য রয়েছে, তা বাস্তব সত্য। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– এই সত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: একটি হলো পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত সত্য; অন্যটি হলো ইন্দ্রিয়াতীত সত্য। আপনি যদি পূর্ণ বা সামগ্রিক সত্য উপলব্ধি করতে চান, তাহলে দুটি সত্যই গ্রহণ করতে হবে, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলবাহ্য জগতকে গ্রহণ করলেই চলবে না। এই দুটি শব্দকেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি (Nature) বলেছেন– প্রথমটি হলো অপরা প্রকৃতি বা নিকৃষ্ট প্রকৃতি (Inferior energy) ও দ্বিতীয়টি হলো পরা প্রকৃতি বা উন্নততর অন্তঃপ্রকৃতি (Superior energy)। পরা প্রকৃতি ইন্দ্রিয়াতীত স্তরে কাজ করে। এই প্রকৃতিকে আমরা স্বভাব বলি। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত প্রকৃতিকে আমরা বলি বহিঃপ্রকৃতি এবং ইন্দ্রিয়াতীত যে প্রকৃতি তাকে বলি অন্তঃপ্রকৃতি। বহিঃপ্রকৃতিকে বলা হয় সাধারণ প্রকৃতি বা অপরা প্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতিকে বলা হয় পরা প্রকৃতি। এই অন্তঃপ্রকৃতির সাথেই মিশে আছে চেতনা বা বুদ্ধি। প্রকৃতিই আমাদেরকে বিভিন্ন কাজ করতে প্ররোচিত করে। যেমন– আমরা খাই, পান করি, শরীরের উন্নতি বিধান করি; এমনকি আমরা স্কুলে যাই, পড়াশুনা করি ও পরীক্ষায় নম্বর পাই ও একটি চাকরি যোগাড় করি। তারপর বিবাহ করি, পরিবার প্রতিপালন করি; এর সবটাই প্রকৃতির খেলা মাত্র। প্রকৃতিই

আমাদেরকে কাজ করতে বাধ্য করে। আমাদের শরীর, আমাদের ইন্দ্রিয়তন্ত্র, এমনকি আমাদের মন– এ সবই তোমার আমার মধ্যস্থ বহিঃপ্রকৃতির এক একটি ঘাঁটি।

এই বহিঃপ্রকৃতি অপরিমার্জিত এবং অত্যন্ত শক্তিশালী। এই অপরিমার্জিত শক্তিই আপনার আমার মধ্যে সক্রিয়। সেই প্রকৃতি আমাদের অন্তরে (অন্তঃপ্রকৃতিতে) প্রচণ্ড বল প্রয়োগ করে আমাদের টেনে নামিয়ে দেয় সাধারণ পশু জীবনযাপন করতে। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে উচ্চতর প্রকৃতিটি বাহ্য প্রকৃতির অধীনে কাজ করে। ফলে অন্তঃপ্রকৃতি নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। এই হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবন চিত্র। এই নিম্ন প্রকৃতিই নানা অপরাধ ও পাপের উৎস। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– জ্ঞানী, বিদ্বান ব্যক্তিও তার অন্তরে অধিষ্ঠিত প্রকৃতির শক্তি দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ে, জীব প্রকৃতির প্রেরণাকেই অনুসরণ করে। জ্ঞানবান ব্যক্তিও অন্তঃপ্রকৃতির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। তাঁর আপন প্রকৃতি বিশেষ নির্দেশ করে ঐ ব্যক্তি কিভাবে কাজ করবে, কী বিশেষ লোক-ব্যবহার অবলম্বন করবে; প্রকৃতি তথা আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি, নির্দেশ করবে, আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধেও। যখন কেউ প্রকৃতির গুণের হাতে ধরা পড়ে যায়, তখন সে ক্রীতদাসে পরিণত হয়। কিন্তু যখনই নিম্ন প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে সংযত করা হয় বা পরিমার্জিত করা হয় ও উচ্চতর স্বভাবটি প্রকাশ পেতে থাকে, তখনই আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির অরুণোদয় হয়। আমরা উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাই। প্রকৃত সভ্যতা আর কিছুই নয়– তা নিম্নতর প্রকৃতির ওপর উচ্চতর প্রকৃতির সামান্য আধিপত্যের ফল। দেবী মাহাত্ম্যের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে–

জ্ঞানিনাম্ অপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদ্ আকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

জগন্মাতাই, মহামায়া, মহতী মোহনী শক্তিরূপে প্রকটিত হয়ে– এই প্রকটিত জগতে লীলাকালে জ্ঞানীদের মনকেও আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, মোহগ্রস্ত জীবনের দিকে, ভ্রান্তিপূর্ণ কাজের দিকে।

বেদান্ত চায় যে লোকে বুঝুক, তাদের ওপর কোন্ শক্তি কাজ করছে? বেদান্তের উত্তর হলো: দুটি শক্তি আছে: বহিঃশক্তি ও আন্তর শক্তি। লোকে এই আন্তর শক্তিগুলিকে উপেক্ষা করে চলে। তাই তারা কষ্টে পড়ে। আমরা যদি এদের উপেক্ষা না করি, আর আমরা যদি জানতে পারি– এই আন্তর শক্তিকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি, তবে আমরা উন্নততর ও পূর্ণতর জীবনযাপন করতে সক্ষম হব। জীব প্রকৃতির প্রেরণাকেই অনুসরণ করে। তুমি প্রাকৃতিক শক্তিকে দমন করতে পার না। সেটা পথ নয়। তাদের শিক্ষা দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, তাদের নতুন দিকে চালিত কর, অর্থাৎ, মোড় ফিরিয়ে দাও। তাদের দমন না করে এসব প্রেরণাকে নতুন নতুন নৈতিক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক দিকে চালিত কর। এ সমস্যা সকলের, বিশেষত মানুষের। পশুকুল নিয়ন্ত্রিত থাকে প্রকৃতির দ্বারা, তারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না। পশুদের মধ্যে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রকৃতির বাহ্য ও আন্তর দুই রূপই বিদ্যমান, উপরন্তু সেখানে আরো কিছু রয়েছে, যা হলো প্রকৃতির সর্বোচ্চ অভিরূপ আত্মা। এই আত্মাই হলো মানুষের মুক্তির উৎস, দেহ-মন সংঘাতের মাধ্যমে আত্মা অভিব্যক্ত হন মুক্তির প্রেরণারূপেঃ আমি আমার জীবনকে নিজের হাতে নিয়ে– তাতে রূপ দিতে চাই। আমি চাই না যে প্রকৃতি এর রূপ দেয়। এইভাবে দেখা যায় প্রতিটি মানব শিশুর মধ্যে মুক্তির একটি উপাদান রয়েছে– কিন্তু কোন পশুর মধ্যে তা নেই।

মানবীয় গঠনতন্ত্রে জড় পদার্থ হলো সেই বস্তু যা প্রকৃতি আমাদের মধ্যে সংস্থাপন করেছে, আর যাকে বলা হয় চেতনা সেটিও উপস্থিত রয়েছে আমাদের পরা প্রকৃতিতে; ক্রমবিকাশে, এর উচ্চতর সম্প্রকাশ দেখা যায় মানবীয় এই গঠনতন্ত্রে। ঐ চেতনা ও তার মুক্তির জন্য প্রেরণা যদি না থাকতো, যদি কেবল সাধারণ প্রকৃতিই থাকতো, তবে আমাদের জীবন সংগ্রাম বলে কিছুই থাকতো না; সে অবস্থায় প্রত্যেকটি জৈবিক প্রেরণায় ইতিবাচক সাড়া দিতাম। কিন্তু যেহেতু ঐ চেতনা রয়েছে, আর তা আবার এই প্রকৃতিরই সঙ্গে যুক্ত– তাই এর বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম বা বিদ্রোহও করে থাকি। ঐ সংগ্রাম থেকে সব রকম নৈতিক জীবন, সব রকম সংস্কৃতি, সব রকম সভ্যতা উৎসারিত হয়েছে। আমার নিজের প্রকৃত স্বভাবকে, যা স্বরূপত শুদ্ধ চেতনা, তাকে তুলে ধরতে চাই। বেদান্ত বলে, আমরা এক একটি চিৎ-জড়-গ্রন্থি, 'চিৎ' অর্থাৎ 'চেতনা' এবং 'জড়' অর্থাৎ 'অচেতনতা বা জাড্যতা'– এদের পারস্পরিক মিলিত অবস্থা। বাহ্য প্রকৃতি হলো জড়, সেই প্রকৃতিই নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছে আমাদের অন্তরে; সেটি শক্তিশালী হলে, আমাদের অভিভূত করে ফেলে। **প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি**, 'এমনকি জ্ঞানী ব্যক্তিও এর চাপে অভিভূত হয়ে পড়ে'।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তুমি প্রকৃতির শক্তির বিনাশ সাধন করতে পার না। প্রকৃতি যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। কিন্তু এর সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা তোমায় জানতে হবে। কোনরূপ অবদমন নয়; অবদমিত শক্তি অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে আসার পথ করে নেয়। বস্তুত ছদ্মরূপে বেরিয়ে আসে। যা তোমার বিবেকবুদ্ধির কাছে প্রিয় বা সুখকর নয়, তা মনের মধ্যে চেপে রাখ। সেখান থেকে সেটি বেরিয়ে আসে ছদ্মরূপে, এরকম সেরকম বিকৃত ব্যবহারের প্রকাশস্বরূপ। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অবদমন কোন উপায় নয়, এইসব শক্তিকে শিক্ষা দাও; তাদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এইসব শক্তির মোড় ফিরিয়ে দাও, এইসব শক্তির অভিমুখের পরিবর্তন ঘটাও। ওগুলি এক একটি শক্তি কেন্দ্র, প্রত্যেকটি আবেগই এক একটি শক্তি কেন্দ্র, প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই এক একটি শক্তিকেন্দ্র। শক্তিকে শুদ্ধ করে, তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। এ সামর্থ্য আমাদের আছে। কেবল একাজ করতে হবে সাবধানে ও বিচার করে, সরাসরি দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নয়। যারা প্রচুর আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী তারা সামনাসামনি দ্বন্দ্বের মাধ্যমে এ কাজ করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা পারে না, আর সেরকম করাও উচিত নয়। এতে তারা যুদ্ধে পরাজিতই হবে। এই হলো 'নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি', কেবল দমনে কি ফল হবে? বরং বিভিন্ন প্রবণতার আবেগগুলির উৎস অনুসন্ধান কর, বুদ্ধি ও বিচারশীল মন নিয়ে; এতেই তুমি উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠতে পারবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥(২/৬০)

হে কুন্তীপুত্র! চিত্তবিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ– পূর্ণজ্ঞানলাভে যত্নশীল ধীমান ব্যক্তির মনকেও প্রবল বেগে বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে।

সম্পূর্ণ শরীরতন্ত্রের মধ্যে মানুষের ইন্দ্রিয়তন্ত্রগুলি খুবই শক্তিশালী। এরই প্রেরণায় প্রত্যেকটি কাজ সম্পাদিত হয়। সুতরাং ঐ ইন্দ্রিয়তন্ত্রের প্রকৃতি কিরূপ সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মানুষ এই ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে নিয়মের বশে আনতে চেষ্টা করে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানী লোকের মনকেও পশ্চাৎদিকে টেনে নিয়ে যায়। এই হলো ইন্দ্রিয়শক্তির প্রকৃতি। সমগ্র ইন্দ্রিয়তন্ত্রই খুব প্রবল; তারা বিদ্যান ব্যক্তিদের মনকেও উড়িয়ে নিয়ে যায়। যেকোন চরিত্র গঠনে, ইন্দ্রিয় শক্তির কিছুটা নিয়মানুবর্তিতা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় কোন রকম চরিত্র গঠনই সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির প্রতি ইন্দ্রিয়ের এই যে আসক্তি, তা পশুস্তর থেকেই আমাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে, আর সেটাই হলো মায়ার জগৎ।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ-স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ (২/৬২-৬৩)

বিষয়সমূহের চিন্তা করতে করতে তাদের প্রতি মানুষের আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে সেটি লাভ করার কামনা জাগে, না পেলে কামনা ক্রোধে পরিণত হয়। ক্রোধ থেকে আসে মোহ এবং মোহ থেকে স্মৃতিশক্তির বিলোপ হয়। স্মৃতি বিভ্রমে মানুষের সদসদ্ বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং বুদ্ধি বিনষ্ট হলে মানুষের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

প্রথমে ইন্দ্রিয়ভোগ বস্তুর দর্শন, তারপর সেটিকে নিয়ে চিন্তা, বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ, পরে সেটি লাভ করার বাসনা। আর যদি লোকে বাধা দেয়, কামনা থেকে ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধ হলে মোহ দেখা দেয়। তখন তুমি পরিবেশের কথা ভুলে যাবে, তোমার বংশপরিচয় ভুলে যাবে, সে অবস্থায় সবকিছুই ভুল হয়ে যায়। সে অবস্থায় তুমি সবকিছু হারিয়ে ফেল। তোমার স্মৃতিশক্তির বিলোপ হয়। তোমার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

ইন্দ্রিয়স্যে ইন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্নবশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ (৩/৩৪)

সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ভেদে যথাক্রমে আসক্তি ও বিদ্বেষ ভাব স্বাভাবিক; কিছুতেই তাদের (আসক্তি ও বিদ্বেষ) অধীনে বশীভূত হবে না, কারণ, এ দুটি মানবের জীবনে শ্রেয়ঃ লাভের রাজপথে প্রতিকূলরূপে পরিচিত।

ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়স্যার্থ কথা দুটির অর্থ যথাক্রমে ইন্দ্রিয় ও তার বিষয়। এ দুটি পরস্পর সম্পর্কিত। কীভাবে তারা সম্পর্কিত? দুটি আবেগের মাধ্যমে, একটি হলো রাগ বা আসক্তি, অপরটি হলো বিদ্বেষ বা ঘৃণা। বিষয় যদি অনুকূল হয় তবে আমি আসক্ত হই; যদি প্রতিকূল হয়, তবে আমি তার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হই, তাকে ঘৃণা করি। এভাবেই আমরা সমস্ত বাহ্য বিষয়ের ব্যাপারে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকি। সুখকর অভিজ্ঞতাকে স্বাগত জানানো হয়। দুঃখজনক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দূরে থাকতে চেষ্টা করি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এদের বশীভূত হয়ো না। কেন? কারণ, তারা মানব জীবনের শ্রেয়ঃ লাভের পথে প্রতিকূল। আমাদের যে স্বভাব বা প্রবণতা বা সংস্কার রাগ ও দ্বেষ সমন্বয়ে গঠিত। এই রাগ-দ্বেষ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন হতে পারে। এই যে বিদ্বেষ বা আসক্তি এটি যদি মনের অবচেতন স্তরে ঘটে তাহলে ইন্দ্রিয়বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কারণ এ বিষয়ে আমরা সচেতন নই। আমাদের যুক্তি বিচারের শক্তি এখানে নেই। এর ফলে আমাদের সংস্কার (স্বভাব) বা প্রকৃতির কোন পরিবর্তন বা উন্নয়ন এখানে ঘটে না। আর যদি এই বিদ্বেষ বা আসক্তি আমাদের সচেতন স্তরে ঘটে তাহলে ইন্দ্রিয়বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং আমরা আমাদের বিচারবুদ্ধি (বিবেক), আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের ধীশক্তি ব্যবহার করে যেটি আমাদের জন্য শ্রেয়স্কর তা গ্রহণ করতে পারি। এই যে আবেগ বা অনুভূতি এদেরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা চাই, তা না হলে তারা আমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। আমাদের সব আবেগের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকে। এই আবেগ যদি সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে ইচ্ছা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে তার দ্বারা কত মহৎ কাজই না সম্ভব হতে পারে। মানুষের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির ক্রমবিকাশ ঘটানোই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, কারণ একমাত্র প্রবল, অবিচল, মানবমুখী ইচ্ছাশক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে বুদ্ধির চাইতেও এই আবেগ বা অনুভূতির শক্তি অনেক বেশি। বুদ্ধি কি করে? সে তার জ্ঞানের শক্তি দিয়ে ঐ দুরন্ত শক্তিগুলিকে সংযত করে। বিবেক হলো বৌদ্ধিক শক্তি বা তেজ যা ভালোমন্দ বিচার করতে পারে। বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থিতিশীল হতে হবে। বুদ্ধিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিচারক্ষম ও স্বচ্ছ চিন্তা করতে সমর্থ করে তোলার জন্য চাই শিক্ষা; তখনই জীবনে শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা লাভ করা সম্ভব হবে। তাই আবেগের রাশ টেনে রাখার মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে বুদ্ধি বা বিচারশক্তি। এই শক্তি আমাদের থাকা চাই। আর তা যদি থাকে তাহলে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেই আমরা শ্রেয়টি গ্রহণ করতে পারি। সেটিই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আর এভাবে কাজ করতে পারলে ধীরে ধীরে আমাদের সংস্কার বা স্বভাবেরও উন্নয়ন ঘটতে থাকে।

ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি খেলে বেড়াচ্ছে তাকে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভ্রমণ উপভোগ করতে হলে ঘোড়াকে সংযত রাখতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– নিজেকে শিক্ষা দিতে হবে। তাদের নতুন দিকে চালিত কর, অর্থাৎ, মোড় ফিরিয়ে দাও। কিছুতেই তাদের (আসক্তি ও বিদ্বেষ) অধীনে বশীভূত হবে না, কারণ, এ দুটি মানবের জীবনে শ্রেয়ঃ লাভের রাজপথে প্রতিকূলরূপে পরিচিত। আমাদের বিচারবুদ্ধি (বিবেক), আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের ধীশক্তি ব্যবহার করতে হবে। প্রকৃতিকে দমন না করে এসব প্রেরণাকে নতুন নতুন নৈতিক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক দিকে চালিত কর।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানম্ উচ্যতে।
এতৈঃ বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ (৩/৪০)

ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি এই তিনটিকেই কামের আশ্রয় বলা হয়। এদেরকে আশ্রয় করেই কাম দেহাভিমানী আত্মার বিবেকজ্ঞানকে আবৃত করে তাকে মোহগ্রস্ত ও ভ্রান্তপথে চালিত করে।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– আমাদের দেহতন্ত্রের মধ্যে অপরাধ ও সমাজের ক্ষতিকারক অন্যান্য অশুভ বৃত্তির উৎস হলো—মন, বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ। সুতরাং এদেরকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজের দোষ, ত্রুটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হতে পারে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি– মানব ব্যক্তিত্বের এই তিনটি উপাদানকে কেন্দ্র করেই সমাজে রোগের সংক্রমণ ঘটে। ঠিক যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমরা রোগের উৎসবিন্দুর খোঁজ করে থাকি, খোঁজ পেলেই আমরা সেখানে প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করে রোগের বিষক্রিয়া দূর করে শরীরের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনি। তেমনি, মানব-শরীর প্রাণবন্ত হয় ইন্দ্রিয় তন্ত্রের দ্বারা; এই হলো প্রথম সংক্রমণ বিন্দু– যেখান থেকে সব রকম অশুভ বৃত্তি এসে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো মন। সাবধান হয়ে যত্ন না নিলে এই মন রোগের সংক্রমণ ঘটাবে। শেষ সংক্রমণ বিন্দু হলো বুদ্ধি বা বিবেক বুদ্ধি– যা ভাল মন্দ বিচার করে। এই বুদ্ধি সংক্রামিত হলে বিচার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে যখন অত্যধিক কাম অর্থাৎ কামনার বা বাসনার উদ্ভব ঘটে এবং তা একটি স্তরের ওপরে চলে যায়, তখন সমাজে নানা দোষ দেখা দেয় এবং তখন বিবেক বা বিচার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে সমাজের অধোগতি শুরু হয়। ধর্ম হয় পরাভূত। এই বুদ্ধি পুরোপুরি সংক্রামিত হলে, আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। আর সংক্রামিত না হলে, আমাদের রক্ষা করতেও পারে। অতএব মানব-ব্যক্তিত্বের মধ্যে থেকে এই তিনটি জায়গায় আমাদের শত্রুর অবস্থান খুঁজে বার করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥(৩/৩৭)

—এ হলো রজোগুণজাত, দুষ্পূরণীয় কামজাত এবং উগ্রপাপ-সৃষ্ট-কামপ্রবৃত্তি, এটি ক্রোধও বটে; একে মানবজীবনের শত্রু বলে জানবে। (অর্থাৎ অতিরিক্ত কাম বা বাসনা মানব জীবনের শত্রু)।

কাম একটি মহান শব্দ। একে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। অকামস্য ক্রিয়া নাস্তি– কাম বা আন্তরিক বাসনা ছাড়া মানুষ কোন কাজ করতে পারে না। সব কাজই হয়ে থাকে কামের প্রেরণায়। অতএব, এখানে কামের প্রশংসা করা হলো। আমাদের গ্রামীণ জনগণকে ধরুন, লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে– কিন্তু উচ্চতর জীবনের জন্য তাদের কোন কাম বা বাসনা নেই; তাই তারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে; তাদের নিরক্ষরতাতেই তারা সন্তুষ্ট– যদিও কাছেই স্কুল রয়েছে। তারা একেবারে বাসনাহীন। আমরা কি বলতে পারি, যে তারা এক একজন মহাঋষি হয়ে গেছে? না মোটেই না। কেবল তাদের ব্যাপারে, প্রথম শিক্ষা হলো, তাদের মধ্যে বাসনা জাগিয়ে তোলা। ছোট ছেলেটি রয়েছে; তাদের মধ্যে বাসনা জাগিয়ে তোল; ফলে সে স্কুলে যাবে। আর পরে কঠোর পরিশ্রম করে আগের থেকে কিছুটা ভাল জীবন কাটাবে। অতএব, জীবনের প্রথম স্তর হলো কাম। ঠিক তেমনি, ক্রোধ, রাগ; কখনো কখনো আমাদের ক্রোধের প্রয়োজন থাকে। মানব জীবন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, যদি সেখানে ক্রোধের– সামাজিক অভদ্রতার বিরুদ্ধে ক্রোধের মত আবেগ না থাকে। কাম ও ক্রোধের একটা স্থান আছে; কিন্তু তাদের সংযত, নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। তারা যেন অন্ধ সেপাই। এখানে দরকার মানবোচিত শিক্ষার, যে শিক্ষায় নৈতিক ও চারিত্রিক সচেতনতার মাধ্যমে মূল্যবোধেরও স্থান থাকবে। সেই স্তরে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে– কাম ও ক্রোধকে; সীমা ছাড়িয়ে গেলে তোমাকে অবশ্যই কামের কাছে না বলতে হবে, তেমনি ক্রোধের ব্যাপারেও না বলতে হবে। তখনই আমরা লক্ষ লক্ষ লোকের সমাজে শান্তিতে বসবাস করতে পারবো। গীতার ৭ম অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– 'আমি সর্বজীবের অন্তরস্থ কাম, কিন্তু সে কাম ধর্মের বা নীতিবোধের অবিরোধী', **ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ**। অতএব, কাম সবসময়েই নিন্দনীয় নয়। কিন্তু নির্বাধ কাম, অসংযত কাম, এমনকি ক্রোধও এবং তৎসহগামী অন্য অশুভ বৃত্তি বা বস্তুকে আমাদের মূল শত্রু বলে জানবে।এটি হলো অপূরণীয় বাসনা, আবার ক্রোধও বটে; তারা মানবের রজোগুণজাত– মহাভোগী ও মহাপাপী, এদেরকে মহাশত্রু বলে জানবে।

গীতা বলে, প্রত্যেক জীবেরই ছয়টি শত্রু রয়েছে। তারা সকলেই মানবসত্তার অন্তরে, যথা: কাম, ক্রোধ, লোভ অর্থাৎ ভোগেচ্ছা; মোহ অর্থাৎ ভ্রান্তি; মদ্ অর্থাৎ গর্ব ও দম্ভ; মাৎসর্য অর্থাৎ ঈর্ষা। এগুলিকে ষড়-রিপু, 'ছয়টি-শত্রু' আখ্যা দেওয়া হয়। কেবল মানুষই এগুলিকে আয়ত্তে রাখতে পারে ও আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে দমনও করতে পারে। এদের মধ্যে কাম ও ক্রোধ হলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও বিপদজনক। এই কাম ও ক্রোধকে মানব কল্যাণের কাজে লাগিয়ে দিতে হবে। এ দুটিকে সংযত রাখতে হবে– যাতে এ দুটি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়। এখানে **মহাশনঃ** কথার অর্থ হলো– বাসনা অন্তহীন। একটি তৃপ্তি হলে, তার জায়গায় দশটি জেগে উঠবে। আর **মহাপাপ্মা** কথার অর্থ হলো– যা তোমাকে ধ্বংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ (৩/৩৯)

—হে অর্জুন, জ্ঞানীর চিরশত্রু অসংযত ভোগ বা কামরূপ দুষ্পূরণীয় আগুনের দ্বারা জ্ঞান ঢাকা থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন– হে অর্জুন, জ্ঞানীর চিরশত্রু হলো অসংযত ভোগ, বাসনা ও কামরূপ দুষ্পূরণীয় আগুন, যার দ্বারা জ্ঞান ঢাকা থাকে। অসংযত, কাম ও ক্রোধ সকল মানবের চিরশত্রু। অর্থাৎ চিরকাল ধরে শত্রু, একবার দুবারের জন্য নয়, সারা জীবনব্যাপী। এই কাম ও ক্রোধ জ্ঞানবানের জ্ঞানকে ঢেকে রাখে, আর জ্ঞান ঢাকা থাকলেই মানুষ সব রকম অপকর্ম করে থাকে। মানবের মন যখন রজঃ ও তমঃ-এর প্রাধান্য প্রবলাকার ধারণ করে, তখন অপরাধ ও অপরাধমূলক নানা সমস্যার উদ্ভব হয়, কিন্তু যখনই মন সত্ত্বের স্তরে উন্নীত হয়, সমস্ত পরিস্থিতি পাল্টে যায়। মানব শান্ত, স্থির, শান্তিপ্রিয় ও করুণাপ্রবণ হয়। মন ঐরূপ অবস্থায় পৌঁছলে, মানুষ অপরাধ করতে পারে না। এ অবস্থা কেমন করে লাভ করব? প্রত্যেকের মনঃ-শিক্ষণের মাধ্যমে। সবকিছুই রয়েছে মনে; তোমার মন যদি সুস্থ থাকে, তবে তোমার সব

কাজই সুস্থ হবে। মন অসুস্থ হলে, তুমি যা করবে তাতেই চাপ সৃষ্টি হবে তোমার মধ্যে, সমাজের মধ্যে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

কাম! জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ কিল জায়সে।
ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি ॥

হাঁয়, এখন আমি বুঝেছি। হে বাসনা, সংকল্প থেকেই তোমার জন্ম। আমি আর কোন সংকল্প করবো না; তাহলে তুমিও আর আমার কাছে আসতে পারবে না।

সংকল্প থেকেই বাসনা এবং বাসনা থেকেই নানাবিধ সামাজিক কর্ম ও মোহগ্রস্ত জীবনের উদ্ভব। বাসনার ফলেই আমি হঠাৎ একদিন ভোগের বস্তু পেয়ে যাই এবং ভোগে নিমজ্জিত হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ি ঐ বাসনার ফলেই। বাসনা চরিতার্থ করে বাসনার নিবৃত্তি হয় না; যেমন (আগুন নেভাতে) আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে তা আরও বেশি জ্বলে উঠে। এমন কোন বাসনা নেই, যা পূর্ণ হবার পর নতুন বাসনার সৃষ্টি করে না। এই অন্তহীন বাসনা বেড়েই চলে এবং তাদের পিছনে ক্রমাগত ছুটে আমাদের জীবন হালকা ও দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং সংকল্প ত্যাগ না করে আপনি যোগী হতে পারবেন না। সংকল্পকেই নিয়ন্ত্রিত এবং সংযত করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ (১৬/২১)

কাম, ক্রোধ এবং লোভ– এই তিনটি নরকের দ্বার যা জীবাত্মাকে ধ্বংস করে; অতএব, এই তিনটিকে ত্যাগ করা উচিত।

এখানে নরক শব্দটি বিশেষ কোন স্থানের নাম নয়। এটি একটি মানসিক অবস্থার নাম। আমরা দিব্য মানসিকতার অধিকারী হতে পারি, আবার নারকীয় মানসিকতার অধিকারীও হতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– নরকে প্রবেশ করার তিনটি পথ বা দরজা রয়েছে; আত্মার নাশক তিনটি দরজা দিয়েই অথবা একটি দরজা দিয়েও আমরা নরকে প্রবেশ করতে পারি। এই তিনটি প্রবেশ পথ কী কী? এই তিনটি প্রবেশ পথ হলো– কাম, ক্রোধ এবং লোভ। কাম হলো ভোগ বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি। নরক-জীবনে প্রবেশের প্রথম দ্বারটি হচ্ছে কাম বা লালসা। সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনে একটু-আধটু কাম বা ক্রোধেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গেলেই কাম অনর্থ বাধাবে, নানা সমস্যা সৃষ্টি করবে। যত রকম শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি– এসবের উৎস এই কাম। ক্রোধ বা রোষ মানুষকে একেবারে উন্মত্ত করে তুলতে পারে এবং সে উন্মত্ততায় কোন অন্যায় কাজ করতেই তার বাধে না। তবে কখনও কখনও সমাজে ক্রোধেরও একটা মূল্য আছে। তবে সে ক্রোধ খুব সংযত হওয়া চাই, পরিশীলিত হওয়া চাই তাতে বন্য উন্মত্ততা থাকলে চলবে না। উন্মত্ত হয়েছেন কি সব গেল। ক্রোধের এই শক্তিকে ন্যায়ের স্বার্থে, সামাজিক কল্যাণের কাজে খুব সংযত হয়ে ব্যবহার করতে হবে। সব শেষে আসছে লোভ। লোভ হচ্ছে অন্তহীন বাসনা। অর্থ উপার্জন করা এবং নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য ভরণপোষণে খরচ করা– সে লোভ নয়। কিন্তু আরো চাই, আরো চাই ভাব, যা মানুষকে অসৎ পথে টেনে নিয়ে যায়। তবে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত; সীমা ছাড়ালেই কাম, ক্রোধ এবং লোভ নরকের দ্বারে পরিণত হয়। সুতরাং অতিমাত্রার কাম, ক্রোধ এবং লোভ পরিত্যাগ করা উচিত।

"তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ" অতএব এই তিনটিকে ত্যাগ কর। আমরা যেন এই তিনটি, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভের কবলে না পড়ি। তারা যেন আমাদের পরাস্ত করতে না পারে। তারা যেন আমাদের প্রভু না হয়; আমরাই তাদের প্রভু– এ কথাই এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাস্তবিক, এই কাম, ক্রোধ ও লোভকে সংযত করার মাধ্যমেই সমাজের নৈতিক বিকাশ সম্ভব হয়। যেখানে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, সে সমাজ অনৈতিক হতে বাধ্য কারণ তার ভিতরে কোন শক্তি নেই। সে সমাজ বা সভ্যতার অন্তিম লগ্ন আসন্ন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ (২/৫০)

সমত্ববুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত যোগী এই জীবনেই পুণ্য ও পাপ থেকে সমানভাবেই মুক্ত হন; অতএব তুমি সম্পূর্ণরূপে এই যোগে (নিষ্কাম কর্মে) আত্মনিয়োগ কর। যোগই কর্মে দক্ষতা নিয়ে আসে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে ভাল-মন্দ কাজ করেছি, সেইসব পুণ্য ও পাপ কর্মের দ্বৈতভাবগুলি– দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। কিন্তু যখন তুমি বুদ্ধি স্তরে উঠবে, তখন তুমি এই দ্বন্দ্বের পারে যাবে, তাই নিজে এই যোগের দর্শন ও কৌশলের সঙ্গে যুক্ত হও। এখানে যোগ হল কর্মে দক্ষতা ও তৎপরতা। তুমি কাজ করছো, তা খুব ভাল। এ কাজ যেমন তোমার সাংসারিক কল্যাণ সাধনের উপায়, তেমনি তোমার নিজের আন্তর উন্নয়নের শিক্ষা প্রণালিও বটে। এই হলো গীতার শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। **যোগ হলো সমগ্র গীতার মর্ম কথা**।

দক্ষতা একটি বড় কথা এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার এটি একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। সব কিছুতেই দক্ষতা চাই, দক্ষ যন্ত্র, দক্ষ কর্মী, দক্ষ পরিচালক, দক্ষ চিকিৎসক ও দক্ষ সেবিকা চাই। সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি, কর্মদক্ষতাই হলো প্রথম ধরনের দক্ষতা। ভাল কর্মী, বলিষ্ঠ ও দক্ষ কৃষক, কারখানার শ্রমিক, প্রশাসক, পেশাদারী শ্রেণির লোক, প্রত্যেককে সমাজের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদনে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে। দক্ষতার এটি একটি দিক। আর দ্বিতীয় দিকটি হলো আধ্যাত্মিকতা। তোমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার উন্নয়ন ঘটেছে কিনা? শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ছিলেন এক বিরাট কর্মকুশলী। তাই তিনি কয়েক সহস্র বছর আগে এমন একটি দর্শনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, যাতে দক্ষতার দুটি মাত্রাই স্বীকৃতি পেয়েছিল– যেখানে পরিমাণ ও গুণগত মান একই সঙ্গে স্থান পেয়েছিল। দক্ষ কর্মীরা কি শান্তিপ্রিয়? তারা কি পরস্পরের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে বসবাস করে? তারা কি পরস্পরকে সেবা করে? এগুলি সবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মানবজীবনের গুণগত মানবৃদ্ধির দ্বারাই সমাজ থেকে যুদ্ধ, হিংসা ও অপরাধপ্রবণতা সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হতে পারে। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ❑

সর্বস্ব দিয়েও কী পেলেন বিদেশিনী নিবেদিতা

শংকর

স্বজাতির বিরক্তি, ভারতীয়দের অবহেলা। নিঃশব্দে তা মেনে নিয়ে, ভারতের সুখ-দুঃখে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। ২৮ অক্টোবর তাঁর জন্মদিন, পূর্ণ হচ্ছে তার জন্মের দেড়শো বছর।

কু-ইংরেজ ও সু-ইংরেজ কথা দু'টি পরাধীনতার শেষ দশকে প্রায়ই শোনা যেত। আমার প্রতিবেশি ও বাল্যসখা, কালামাজু লুজলিফ কোম্পানির কেরানি বাদলকাকু বলতেন, সায়েব যখন খারাপ হয় তখন সে দুনিয়ার ওঁচা, আর সায়েব যখন ভাল হয়, বিশ্বসংসারে তার তুলনা নেই। যেমন কাকুর লিভিংস্টোন সায়েব অন্তর থেকে চাইতেন, ইন্ডিয়ার মোহনবাগান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল টিম হোক।

সাতচল্লিশের স্বাধীনতার সময় বাদলকাকু বলতেন, দুঃখ একটাই, কু-ইংরেজের সঙ্গে সু-ইংরেজগুলোও দেশছাড়া হবে। তার পরে কয়েক বছরের ব্যবধানে, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের আদালতি কর্মক্ষেত্রে এ দেশের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার নোয়েল বারওয়েলকে আবিষ্কার, যিনি এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইলেন না এবং তাঁর ভারতপ্রেমিকা স্ত্রী ক্যারিয়ন বারওয়েল স্বামীর এই সিদ্ধান্তে ভীষণ খুশি হলেন।

কিন্তু সেই সময় চোখ খুলল, সায়েবের সিনিয়র বাবু বিভুতিদা দুঃখ করতেন, যে সব সায়েব আমাদের ওপর অত্যাচার করল তাদের আমরা লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলাম সেলাম ঠুকতে ঠুকতে, আর যাঁরা আমাদের ভালোবাসলেন অকারণে, আমাদের কাছে টানতে চাইলেন, তাদের আমরা দিলাম অকারণ কষ্ট। বারওয়েল সায়েবের ছাত্রজীবনের বন্ধু দীনবন্ধু অ্যান্ডরুজের কথা উঠত। কলকাতায় কেমব্রিজ ডিনারে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি না বললেন, কারণ প্রত্যাশিত ডিনার জ্যাকেট তাঁর নেই। শেষ পর্বে দেহাবসানের আগে দীনবন্ধু যৎসামান্য যা ছিল তা উইল করবার জন্য তিনি বন্ধু নোয়েলকে হাসপাতালে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার জন্য স্বার্থপর সায়েবদের বিরুদ্ধে ব্যারিস্টার বারওয়েল নিজে মামলা করেছিলেন, ফলে কলকাতার বিরক্ত ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তাঁকে বর্জন করেছিলেন, আর ঠিক একই সময়ে 'নতুন স্বদেশি'রা ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের সরকারি কাজ থেকে বঞ্চিত করে আর্থিক অনটনে ফেলেছিলেন। এর কিছু দিন পরেই আর একজন সু-ইংরেজ, প্রাক্তন আইসিএস আর্থার হিউজ-এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল সেকেন্ড ক্লাসের ট্রামে, খরচ বাঁচিয়ে কয়েকজন অনাথ বালককে মানুষ করবার জন্যে তিনি যে চেষ্টা করতেন তা কিন্তু কারও নজরে পড়ত না। আমার চোখ খুলে গিয়েছিল, বুঝিয়েছিলাম, সু-ইংরেজও এ দেশে অত্যধিক কষ্ট পেয়েছেন, সর্বস্ব ত্যাগ করে এ দেশেকে যাঁরা ভলোবাসতে চেয়েছেন তাঁরা প্রায়ই পেয়েছেন স্বজাতির বিরক্তি এবং ভারতীয়দের অবহেলা। আমাদের দারিদ্র্য নিষ্ঠুর ভাবে তাঁদের আক্রমণ করেছে, তবু আমাদের অবজ্ঞা তাঁরা কেউ কেউ নিঃশব্দে মেনে নিয়ে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এমনই এক বিরামহীন ত্যাগ এবং দারিদ্র্য-দহনের কাহিনী নিবেদিতার, যাঁকে আমরা 'সিস্টার' বলেই জানতাম ছাত্রাবস্থায়, মনে হত প্রাচীন এক সভ্যতার দুঃখ লাঘবের জন্য এবং স্বজাতির অপকর্মের কিছু ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে নিবেদন করেছিলেন।

> বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে বিশ্ব-মধ্যে উপস্থাপিত করার জন্য নিবেদিতা আবার অর্থসন্ধানে বেরিয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যে এসে গিয়েছিলেন দীর্ঘ দিনের উপকারী বন্ধু সারা বুল ও তাঁর উইল।

বিদেশিনী নিবেদিতার এই নিঃশর্ত আত্মনিবেদনকে আমরা কীভাবে নিয়েছিলাম, তার পরিবর্তে আমরা তাঁকে কী দিলাম, বা কী দিলাম না তার হিসেব-নিকেশ একশো বছরেও হল না। তাঁর জন্মের সার্ধশত বর্ষে তাঁর তেতাল্লিশ বছরের নিদারুণ কষ্টের বিবরণ ঠিক মতো তৈরি হলে, ভবিষ্যতে কেউ আর নিজের মেয়ের নাম 'নিবেদিতা' রাখবে না, বুঝবে এই শব্দটির মানে শুধু দিয়ে যাওয়া, প্রতিদানে প্রায় কিছুই না পাওয়া এবং সেই সঙ্গে প্রশ্ন, মানুষের ইতিহাস কোন অদৃশ্য শক্তির ধারায় এমন সব আশ্চর্য বিদেশিনীর সৃষ্টি করে এবং তাঁর অজানা দেশে নিজেদের তিলে তিলে নিজেদের উৎসর্গ করেন।

কোন সাহসে একত্রিশ বছরের মার্গারেট নোবল ইংল্যান্ডের নিশ্চিন্ত জীবন ত্যাগ করে অজানা ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন,তা আজও সম্পূর্ণ গবেষিত হয়নি। আমরা শুধু জানি, মধ্যবিত্ত পরিবারের এই কন্যা লন্ডনের খ্যাতনামা স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন, ভারতবর্ষের দরিদ্রদের শিক্ষার জন্য এক সময় পরিচিত জনদের কাছ থেকে চাঁদা তুলেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুযায়ী স্বামী ব্রহ্মানন্দ মাঝে মাঝে তাঁকে রিপোর্ট পাঠাতেন। ব্রহ্মানন্দের এমন এক রিপোর্ট নিবেদিতার সদ্য-প্রকাশিত সহস্র পত্রাবলির গোড়ায় স্থান পেয়েছে, তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭। পত্রলেখকের ঠিকানা বরানগর মঠ, এই মঠ তখনও রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত হয়নি, প্রতিষ্ঠানকে বর্ণনা করা হয়েছে 'সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউশন' বলে, আদিতে যার সভ্যসংখ্যা এগারো, পরে বেড়ে হয়েছে তেইশ। আরও ছয় জন রয়েছেন ব্রহ্মচর্যের সাধনায়।

নিবেদিতা সঙ্গে করে কত অর্থ নিয়ে মোম্বাসা জাহাজে চড়েছিলেন তা আজও কারও স্পষ্ট জানা নেই, তবে আন্দাজ করা যায়, তাঁর প্রধান সমর্থক ছিলেন মিস হেনরিয়েটা মুলার, যিনি বেলুড় মঠের জমি কেনার অর্থ বিবেকান্দকে জুগিয়েছিলেন। তবে ইঙ্গিতে মনে

হচ্ছে তিনি কলকাতায় নিবেদিতার সঙ্গে থাকতেন, মিস মুলারের এমন প্রত্যাশা ছিল কিন্তু বিদেশে পদার্পণের সেই ঐতিহাসিক ক্ষণে মিস মুলার কলকাতায় নেই। মিস মুলারের উপর মার্গারেটের বিশেষ নির্ভরতা স্বামীজীর তেমন পছন্দ ছিল না, এই মহিলা যে এক সময় বিনা নোটিসে দলত্যাগিনী হতে পারেন তা বোধ হয় স্বামীজী আন্দাজ করেছিলেন।

আলমোড়া থেকে মার্গারেটকে লেখা বিবেকানন্দের চিঠির বক্তব্য (২৯ জুলাই ১৮৯৮) খুবই স্পষ্ট। এ দেশে কোনও শ্বেতাঙ্গিনী রমণীর বসবাস কত কঠিন, তা দূরদর্শী স্বামীজীর চোখের সামনে রয়েছে। একদিকে এ দেশের দরিদ্র অশিক্ষিত, নানা অন্ধবিশ্বাসে ভরা, দাসত্ব-মনোভাবের পুরুষ ও নারী এবং অন্য দিকে স্থানীয় ইংরেজ সায়েব-মেমরা, যাঁরা দিশি পাড়ায় স্বেচ্ছায় বসবাসকারিণী বিদেশিনী মেয়েকে মাথা-খারাপ অথবা ছিটগ্রস্ত ছাড়া আর কিছুই ভাববেন না। যে ইংরেজি শব্দটি স্বামীজীর স্মরণে এসেছে, সেটি হল 'ক্র্যাঙ্ক'। 'ঝাঁপ দেবার আগে আর একটু ভেবে দেখো', এই সাবধানবাণীর সঙ্গে, স্বামীজী ধনবতী মিস মুলারের ব্যাপারে বিবেদিতাকে সোজাসুজি বলেছেন, কারও ছত্রচ্ছায়ায় থাকাটা ঠিক হবে না। 'এই মহিলা ভাল মানুষ, কিন্তু তাঁর ধারণা, নেত্রী হওয়ার সব গুণ নিয়েই তাঁর জন্ম এবং এ জগৎকে বাগে আনতে যা একমাত্র প্রয়োজন তা হল টাকা। এই ঔদ্ধত্য মহিলার মাথায় বারবার ফিরে আসে এবং খুব অল্পদিনের মধ্যে তুমি বুঝতে পারবে এর সঙ্গে কিছু কাজ করা অসম্ভব।' স্বামীজীর কাছে আরও খরব আছে, নিবেদিতা এবং অন্য আমেরিকান মহিলাদের জন্য মিস মুলার কলকাতায় যোগ্য বাসস্থান খুঁজেছেন, কিন্তু ওঁর ভয়ংকর মেজাজ ও চঞ্চলমনস্কতা এই মহিলা নিবাসের পরিকল্পনাকে নষ্ট করে দেবে। মার্গারেটের ভারত যাত্রার অনেক আগেই দূরদর্শী সন্ন্যাসীর সাবধানবাণী, 'নিজের পায়ে দাঁড়ানো ছাড়া অন্য কোনও পথই নেই।'

মার্গারেট নিশ্চই সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা দেখছি, কলকাতায় মিস মুলারের কাছ থেকে ১৫ টাকার চেক তাঁর কাছে বেশ মূল্যবান। এর পরেও মুলারের চেক এসেছে কলকাতায়, কিন্তু সেই সঙ্গে শর্ত, এই টাকা মার্গারেটের জীবনধারণের জন্য, এর কোনও অংশ কোনও ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কলকাতায় পদার্পণের কয়েক দিনের মধ্যে, মার্গারেট চিঠিতে মিসেস এরিক হ্যামন্ডকে জানাচ্ছেন, ভাগ্য আমার কাজের ব্যাপারে ওঁর দেওয়া অর্থের নির্ভরতা নেই, মিস মুলার আচমকা হিন্দুত্ব ত্যাগ করে তাঁর পুরনো ধর্মে ফিরে গিয়েছেন।

যে নিবেদিতা এ দেশের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন তার একটা ছবি আছে, কিন্তু নেই তেমন নির্ভরযোগ্য ভারতীয় বর্ণনা। নিবেদিতার যেখানে যা বর্ণনা পেয়েছি, তার মধ্যে বিবেকানন্দ-অনুরাগী এবং মার্গারেট-বন্ধু, প্রতিভাবান সাংবাদিক-লেখক এরিক হ্যামন্ডের বর্ণনাটা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। মানসচক্ষে আমি এই ভারতভগিনীর ছবিটা দেখতে পাই। কলকাতা যাত্রার কিছু আগে এই বর্ণনা তৈরি করেছিলেন প্রিয় বন্ধু, বিবেকানন্দ-অনুরাগী এরিক হ্যামন্ড। ছবিটা আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, আইরিশ কন্যার এর থেকে ভাল বর্ণনা আজও আমার চোখে পড়েনি: 'অনন্যা সাধারণ জ্যোতির্ময়ী এক তরুণী। নীল উজ্জ্বল নয়ন। বাদামি স্বর্ণাভ কেশ। স্বচ্ছ উজ্জ্বল বর্ণ। মুখের মৃদু হাসিতে এক আকর্ষণীয় শক্তি। দীর্ঘ অঙ্গের প্রত্যেকটি পেশী যেন গতিশীল, আবেগচঞ্চল। আগ্রহ, উদ্যমে পূর্ণ হৃদয়, নির্ভীক।'

এই মার্গারেট নোবল মোম্বাসা জাহাজে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন ২৮ জানুয়ারি ১৯৯৮, স্বয়ং বিবেকানন্দ উপস্থিত জাহাজ ঘাটে। প্রথম রাত্রি এসপ্ল্যানেডের কোথায় মার্গারেট বাস করেছিলেন, তা ঠিক স্পষ্ট নয়। তাঁর সঙ্গে মুলারের সম্পর্কের ইতি হওয়ার গোড়ার দিকের চিঠিতে অর্থচিন্তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। এই পর্বে নিবেদিতার দু'টি মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে, এ দেশে বুদ্ধিজীবীদের উপার্জন কম এবং মাসিক ১৫ টাকার মধ্যে বাড়িভাড়া, জামা-কাপড়, খাবার জোগাড় সম্ভব হলেও দৈনন্দিন যাতায়াতের খরচ রাখা সম্ভব কি না। সে কালের কলকাতায় খাবার সস্তা হলেও যানবাহনের খরচা কম ছিল না এবং পরবর্তীকালে তিনি ঠাকুর পরিবার থেকে একটা বাইসাইকেল উপহার পেয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

এরই মধ্যে আরও দুঃসংবাদ। বোসপাড়া লেনের বাড়ি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে মার্গারেট জানাচ্ছেন স্বামীজীর সঙ্গে হওয়া কথাবার্তা। 'তিনি বললেন আমাকে বিলেতে ফিরে যেতে হবে, কারণ এখানে টাকা নেই এবং টাকা জোগাড়ের সম্ভাবনাও নেই।' প্রস্তাবিত স্কুল সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর আরও স্পষ্ট কথা, আবাসনে অন্তত ১০/২০ ছাত্রী জোগাড় করতে না পারলে সব চেষ্টা জলে যাবে। আরও কঠিন কথা ছাত্রীদের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা— 'আমি হঠাৎ ঘরে গেলে ওরা কোথায় যাবে।' জানা যাচ্ছে, স্বামীজী তাঁর শিষ্যার জাহাজের রিটার্ন টিকিট প্রায় কিনে ফেলেছিলেন।

অভিমানিনী নিবেদিতা তখন স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আমি কি আপনার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছি?" স্বামীজীর উত্তর, "তুমি না, আমরাই ফেল করেছি।" টাকার কথা আবারও উঠেছে,

নিবেদিতা সোজাসুজি বলেছেন, "এখনও তো তাঁর কাছে ৬৩০ টাকা রয়েছে, তাতে হাত দেওয়া হয়নি। স্বামীজী, আমার ভরনপোষণের চিন্তা করবেন না, আমার কাছে যা আছে তাতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চলে যাবে।" স্বামীজী তখন রাজি হয়ে গিয়েছিলেন।

এই সময়, তখনকার সুবিখ্যাত অ্যাটর্নি ও স্বামীজীর অনুরাগী মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় সন্তোষিণী নামে এক ছাত্রীর জন্য কিছু অর্থ সাহায্যে রাজি হয়ে গিয়ে এই সংকটের সাময়িক মোকাবিলা করলেন। নিবেদিতা ভাবছেন, যদি ১৫০ পাউন্ড জোগাড় করা যেত তা হলে পাঁচটি ছাত্রীকে এক বছর হস্টেলে রাখা সম্ভব হত। এই সব দুঃখের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আজও তেমন ভাবে সংগ্রহ করিনি। আমাদের জেনে রাখা ভাল, ছাত্রী সন্তোষিণী নিবেদিতার শোওয়ার ঘরেই থাকতেন, মোহিনীবাবুর কাছ থেকে তার জন্য ছ'মাসের খরচ বাবদ নব্বই টাকার চেক পেয়ে নিবেদিতা যেন স্বর্গ হাতে পেলেন।

মিস ম্যাকলাউডকে বাগবাজার থেকে লেখা এক চিঠিতে (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯) নিবেদিতা সই করেছেন 'ইওর ওনলি চাইল্ড মার্গারেট।' ফুটনোট লিখছেন, 'একমাত্র সমস্যা অর্থ, আমাকে যদি ফিরে যেতে হয়, মিসেস কুলস্টন কি আমার এখানকার দায়িত্বটা নিতে পারবেন?'

এ দেশের ইংরেজ মহলে দিশি পাড়ায় বসবাসকারী নিবেদিতার যে প্রবল সামাজিক নিন্দা হবে তা হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমরাও যে সব সময় তাঁকে মাথায় তুলে রাখিনি, তার ইঙ্গিত রয়েছে নিবেদিতার বিভিন্ন চিঠিপত্রে। জানা যাচ্ছে, এখানে থাকার জন্য একটা বাড়ি কষ্টে সৃষ্টে জুটলেও কাজের লোক পাওয়া সহজ ছিল না। হিন্দু পরিচারিকা কেন খ্রিষ্টানের বাড়িতে কাজ করতে আসবে? শেষ পর্যন্ত এক বুড়িকে পাওয়া গেল, কিন্তু ঝি-এর শর্ত— নিবেদিতা কখনও তার রান্নাঘরে ঢুকবে না, অথবা তার উনুন ও জল স্পর্শ করবে না। নিবেদিতার চায়ের পাত্র স্পর্শ করবার জন্য এই পরিচারিকা যেন স্নান করত, তার বর্ণনাও রয়েছে। পরে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু অন্য কোনও মেমসায়েব চা এলে নিবেদিতাকেই অতিথির কাপ-ডিশ ধুতে হত। তাঁর জীবনীতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে, হয়তো তাঁর মনে এর অন্য বেদনাও লেগেছে।

যে বিদেশিনী এই দেশকে ভালোবাসেন এবং পরিবর্তে নানা দুঃখ, অন্তহীন নিঃসঙ্গতা ও অকাল মৃত্যু পেলেন, তাঁর সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্য প্রসঙ্গে বলা উক্তিটা বেশ মিলে যায়— 'যারা শুধু দিল, পেল না কিছুই, সারাজীবন ধরে ভেবে পেল না কেন সব কিছু থেকেও কোনও কিছুতেই অধিকার নেই তাদের, তারাই আমার মুখ খুলে দিল।' নিবেদিতা কিন্তু সব মুখ বুজেই সহ্য করেছেন।

তাঁর ৪৩ বছরের জীবনে নিবেদিতা যত আঘাত শত্রু ও আপনজনদের কাছ থেকে পেলেন তার নির্ভরযোগ্য বিবরণ সংগ্রহ করলে একটা পাঁচশো পাতার বই সহজেই হয়ে যায়। পরবর্তী কালে এ দেশের কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন পরিস্থিতি সামাল দিতে, প্রমাণ করতে এই বিদেশিনীর প্রতি কেউ তেমন অন্যায় করেনি, যা কিছু ঘটেছিল তার সবই পরিস্থিতির পাকে। কিন্তু ব্যাপারটা বোধ হয় অত সহজ নয়। কয়েকটা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে নেওয়াটা বোধ হয় অন্যায় হবে না।

নিবেদিতা সমস্ত জীবন ধরে কত আঘাত পেয়েছেন, কত অবহেলা অপমান সহ্য করেছেন তা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন স্মৃতিচারণে। স্বয়ং নিবেদিতা একজন বিদেশিনীকে বলেছিলেন, যখন আলমোড়ায় স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন তখন প্রায়ই তাঁকে কাঁদতে হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, সিস্টার ক্রিস্টিন স্কুলে আসার পর তিনি বেলুড় মঠে খুবই কম যেতেন, তাঁর মনে হয়েছিল স্বামীজী ক্রিস্টিনকেই শিক্ষা দেবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। নিবেদিতা আশংকা করেছিলেন, তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। সুতরাং তিনি স্কুলে থাকতেন, নিঃসঙ্গ যাতনায়।

৪ জুলাই স্বামীজীর আকস্মিক তিরোধানের পর দিন সকালে বেলুড়ে নরেন্দ্র-জননী ভুবনেশ্বরীকে তিনি দেখেছিলেন। তবে দেহাবসানের কয়েকদিনের মধ্যে মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ বড়ই তড়িঘড়ি হয়েছিল বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের মনে করা উচিত, সেই সময় মিশনকে কোনওভাবে রাজনীতিতে জড়ানো হলে মিশনের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারত। মিশন-সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন, বিচ্ছিন্ন হওয়ার খবরটা নিবেদিতাই সংবাদপত্রকে জানিয়েছিল।"

ব্যাপারটা হয়েছিল ১৯ জুলাই ১৯০২ সালে। যাকে ঠিক বিতাড়িত বলা বোধহয় ঠিক নয়। পরবর্তীকালে নিবেদিতা কিন্তু তাঁর এক প্রিয়জনকে বলেছিলেন, "ছাপার অক্ষরে যখন কথাগুলো দেখলাম, মনে হল এর আগে মরলাম না কেন?"

এখানেই শেষ নয়, এর পরেও এক দশক ধরে সীমাহীন যন্ত্রণার সুদীর্ঘ ইতিহাস। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে বিশ্ব-মধ্যে উপস্থাপিত করার জন্য নিবেদিতা আবার অর্থসন্ধানে বেরিয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যে এসে গিয়েছিলেন দীর্ঘ দিনের উপকারী বন্ধু সারা বুল ও তাঁর উইল, যেখানে জগদীশের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ রেখে যেতে চেয়েছিলেন মিসেস সারা বুল।

এই উইলের প্রতিবাদ জানিয়ে সারা বুলের কন্যা ওলিয়া আমেরিকার আদালতে যে মামলা করেছিলেন তাতে অনিচ্ছাকৃত

ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন নিবেদিতা। সারার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত থাকার জন্য নিবেদিতা ছুটে গিয়েছিলেন আমেরিকায়। এই মামলার বিপুল প্রচার এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদের আচরণ নিয়ে সত্য-মিথ্যা যে সব রিপোর্ট দিনের পর দিন সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল, তার ধাক্কা সামলাতে বেশ সময় লেগেছিল। ওলিয়ার জয় হয়েছিল। গভীর আঘাত পেয়েছিলেন নিবেদিতা। সেই সঙ্গে এসেছিল নিঃসঙ্গতা। এরই মধ্যে ওলিয়ার অকালমৃত্যু এবং পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন।

জীবনের শেষ পর্বে নিবেদিতার অভিজ্ঞতা বড়ই বেদনাময়। তার বিস্তারিত বিবরণ আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। আমরা শুধু জানি, নিবেদিতা আবার ভারতে ফিরে এসেছিলেন। তবে যা অনেক সময় নজরে পড়ে না, বেলুড় মঠের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনও ব্যাহত হয়নি। নতমস্তকে তিনি প্রায়ই মঠে আসতেন এবং সন্ন্যাসীরা আসতেন তাঁর স্কুলে। শ্রীশ্রীসারদামণির সঙ্গে সম্পর্ক, সেও এক বিস্ময়! আমরা এখন জানি, নিবেদিতা মায়ের সঙ্গে সাধু বাংলায় কথা বলতেন। সেই নিয়ে রসিকতাও হত। যা সবাই জানে না, শ্রীমায়ের পা বাতে পঙ্গু হওয়ায় নিবেদিতা প্রায় তাঁকে কোলে করে উপরতলায় তুলতেন এবং এই কাজ করে তিনি সীমাহীন আনন্দ পেতেন।

মামলা-মোকাদ্দমার দীর্ঘ ছায়া বিদায়কালেও দূর হয়নি। জগদীশ বসুর অতিথি হয়ে তিনি দার্জিলিং-এ রায় ভিলায় বসবাস করেছেন। সেখানে ১৩ অক্টোবর, ১৯১১ সালে সব যন্ত্রণার অবসান চুয়াল্লিশ বছর পূর্ণ করার আগে। মহাপ্রয়াণের মুহূর্ত খুব দূরে নয় বুঝেছিলেন নিবেদিতা। ১৯০০ সালে কলকাতায় এক পরিচিতকে বলেছিলেন, "আমি আর এগারো বছর বাঁচব।" দার্জিলিং -এ মৃত্যুশয্যায় উইল রচনার ব্যবস্থা হল। এই উইলেও সারা বুল মামলার ছায়া। 'বস্টন শহরনিবাসী উকিল মিস্টার ই বি থর্প আমাকে অথবা আমার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে যা কিছু দেবেন, বেঙ্গল ব্যাংকে আমার যে তিনশো পাউন্ড আন্দাজ জমা আছে, পরলোকগতা ওলি বুল পত্নীর সম্পত্তির মধ্যে আমার যে সাতশ পাউন্ড রয়েছে এবং আমার যাবতীয় বইয়ের বিক্রয়লব্ধ আয় সেই সব আমি বেলুড়ের বিবেকানন্দ স্বামীজীর মঠের ট্রাস্টিদের দিচ্ছি। তাঁরা এই অর্থ চিরস্থায়ী ফান্ড হিসেবে জমা রাখবেন এবং ভারতীয় নারীদের মধ্যে জাতীয় প্রাণালিতে জাতীয়শিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁরা মিস ক্রিস্টিন-এর পরামর্শ মতো তার আয় ঐ কাজে ব্যয় করবেন।'

তাঁর সৎকারক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় লিপিটি মিশনের দান নয়। এটি স্থাপন করেছিলেন স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, যেখানে ইংরেজিতে লেখা আছে, এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিত— যিনি ভারতবর্ষকে তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন। এই অবিশ্বাস্য নিবেদনের পরিবর্তে আমরা তাঁকে কী দিয়েছি বা এখনও দিতে পারি, তার হিসেব হতে পারে এ বারের সার্ধশত জন্ম বছরে। ❑

(***Female Divinity in Hinduism***– *৪৯ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)*

ryhmicmetra (Sound vibration, Spanda). She resembles Vac Devi (Sarasvati) or 'Shabda Brahman'.

In 'Mahabharatas' we find water along with other 'mahabhutas' of samkhya as the material cause of evolution (Parinam). Gita describes 'Bhagaban' as the ultimate Divine Being equated to Brahman and Prakriti as His second nature. Different Puranas elaborate on the functions of Shakti. She is attributed different names. Vaishnava literatures call Her Lakshmi. Bhagavat Puran describes Narayan (Brahman) asleep in the ocean of consciousness upon Sesa or Ananta (coiled serpent). He preserves His Brahma Shakti in the potentiality of Time (Kal as in father). This Shakti emerges out of His naval as Brahma (last as in father) as a Lotus (Padma-rhythmic vibration). Eventually three worlds came to be. The Purans weave many ancient tales of gramdevis (local goddesses) within the Vedic and Tantrik frames.

Tantrik Scriptures stress more on the female roles of the Divinity. Markandeya Puran is one such important Puran. Devi Mahatmya (also called Sapta Sati and better known as Chandi) is a part of this Puran. This text raises the Devi to the highest reality-Brahman. Devi is indescribable but for human comprehension She is called variously as Maha Maya, Mula Prakriti, Maha Shakti etc. She is eternal but incarnates with different names for different purposes. She pervades the whole Cosmos. She dwells in every being. As Brahman the Mother is both Nirguna (an appropriate transliteration is 'inactive') as well as the active potency. She is the source and finality of a She is thell that we are or ever will be. As 'Shabda Brahman' She is also the principle of activation. She is the Supreme and only Reality.

It may be noted before conclusion that the title of this article is somewhat of a misnomer. Even graspable entities like light or sound can not be given a gender identity or be quantified. The concept of Divinity is transcendent, intangible and abstract. Mundane categorization by number or gender only delimits the Divinity. Various Scriptural male or female names are for introducing the abstract concepts. The Vedic statement "Truth is one, scholars use multiplicity of names" should guide us in our study. ❑

Om Tat Sat!

দুঃখ নাশের আরাধনা

সুমন গুপ্ত

আজ মহাশিবরাত্রির মহা উৎসবকে কেন্দ্র করে বারাণসীর শ্রীবিশ্বনাথ মন্দির ও রামেশ্বরমের শ্রীরামেশ্বরম মন্দিরে হই হই ব্যাপার। ভারতবর্ষের দুই প্রান্তে অতি বিখ্যাত এই দুটি জাগ্রত শিবমন্দিরে এই মুহূর্তে ভক্তজনের ঢল নেমেছে। কোথাও তিলধারণের জায়গা নেই। শিবরাত্রি চার প্রহর জাগরণ ও শ্রীকাশী বিশ্বনাথ ও শ্রীরামেশ্বরম শিবের যথোচিত পুজো অর্চনার মধ্য দিয়ে পুণ্যার্থীরা তাঁদের মনের ইচ্ছা পূরণ করবেন। অগণিত ভক্তজনের কণ্ঠনিঃসৃত শিব শ্লোকে যে এই দুটি পুণ্যদায়ী শৈবক্ষেত্র এখন মুখরিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'পূজিতো লিঙ্গরূপেজস্মিন প্রসন্নো বিবিধং ফলম্
দাস্যামি সর্ব্বলোকেভ্যো মনোঽভীষ্টান্যনেকশঃ
যদা দুঃখং ভবেৎ তত্র পূজিতে দুঃখনাশনম্।'

গভীর অর্থবহ এই সুন্দর শ্লোকের অন্তর্নিহিত অর্থ স্বয়ং শংকর ভগবান শিবপুরাণে এভাবে ব্যক্ত করেছেন—'এই লিঙ্গরূপে আমার পূজা করিলে আমি প্রসন্ন হইয়া সকল লোককে বারংবার সকল প্রকার অভীষ্ট ফল দান করি। অধিক কী বলিব, যখন যখন মনুষ্য দুঃখপ্রাপ্ত হইবে, তখন তখন এই লিঙ্গের পূজা করিলে সকল প্রকার দুঃখ বিনষ্ট হইবে।'

ধার্মিক হিন্দুদের বিশ্বাস শিবরাত্রির শিবলিঙ্গের মাথায় গঙ্গাজল ঢালতে পারলে অশেষ পুণ্যার্জন সম্ভব। দেবাদিদেব হলেন ভোলেভালা। তাঁকে সামান্য বিল্বপত্র দিয়ে পুজো করলেই তিনি সন্তুষ্ট। আর অবিবাহিত হিন্দু নারীরা তো শিবের মতো উন্মুক্তমনা বর পাওয়ার জন্য শিবরাত্রিতে উপবাস পালন অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। শিবপুজোর পর মানত করেন অনেকেই। যেহেতু কাশী বিশ্বনাথ এবং রামেশ্বরম শিব উভয়েই আলাদা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, আর ভক্তের মনোবাঞ্ছা সত্বর পূরণ করেন বলে সর্বসাধারণের বিশ্বাস তাই এই বিশেষ দিনটিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ছুটে যাওয়া ওই দুই প্রাচীন তীর্থে।

কাশী বা বারাণসী ভারতের অন্যতম প্রাচীন নগরী। বিশ্বনাথের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রধান জ্যোতির্লিঙ্গটির উপস্থিতি এই স্থানের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। প্রাচীনকালের কথা। একবার মহাদেব প্রজাপতি ব্রহ্মার অনুরোধে ও মন্দার পর্বতের অশেষ আরাধনায় প্রীত হয়ে এই পর্বতকে বরদান করেন। কি ছিল সেই বরদান? কি ছিল সেই বর? দেবাদিদেব গৌরীসহ কিছুদিন ওই পর্বতে বসবাস করবেন। ভোলানাথ যখন একবার কথা দিয়েছেন তখন এর অন্যথা হতে পারে না। কিন্তু প্রিয়ধাম কাশী ছেড়ে এতদিনের জন্য অন্য একটি জায়গায় থাকবেন কী করে? অথচ সেই মুহূর্তে কাশী ত্যাগ না করেও তাঁর উপায় নেই। দেবাদিদেব তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেন, কাশীক্ষেত্রে তিনি লিঙ্গরূপেই অবস্থান করবেন। এরপর তিনি গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে মন্দার পর্বতে এসে পৌঁছলেন। স্থানান্তরে বসবাস করেও নিজ ক্ষেত্র কাশীকে আপনার সংসর্গ থেকে কখনও বিমুক্ত করেননি মহাদেব। তাই কাশী ও এই লিঙ্গ উভয়েরই নাম 'অধিমুক্ত' বলে খ্যাত। লিঙ্গপুরাণে রয়েছে— 'বিমুক্তং ন ময়া অস্মান্মোক্ষতে বা কদাচন/সমক্ষেত্রমিদং তস্মাৎ অভিমুক্তমিতি স্মৃতম্' 'কাশিখণ্ড'–এ (স্কন্দপুরাণের একাংশ) বলা হয়েছে— 'অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রম্ ন মুক্তং সংভুনাক্কচিৎ।' অর্থাৎ অবিমুক্ত এক মহাক্ষেত্র কাশী। এই শ্রশ্রীঅবিমুক্তেশ্বরই সকলের আদি লিঙ্গ। এর আগে জগতে কেউ কোনও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা বা শিবলিঙ্গের আকৃতি কেমন, তাও কেউ জানত না। স্বয়ং শিব এই লিঙ্গ স্থাপন করলে যথোচিত অর্চনার পর বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এঁর পুজো করেন। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য এবং বিশ্বামিত্রের মতো মুনি ঋষিরাও শ্রীঅবিমুক্তেশ্বরের পুজো করেছেন বলে জানা যায়। শ্রীঅবিমুক্তেশ্বর সৃষ্টি হওয়ার পরই যুগে যুগে মহর্ষিরা পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে বসবাস করেন।

> অভিনব গুপ্তর তন্ত্রালোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও সদাশিবের উপরে পরমশিবের স্থান। আর এই পরম শিবই হলেন শ্রীঅবিমুক্তেশ্বর। শ্রীবিশ্বনাথের মতো শ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গ আর কোথাও নেই।

অভিনব গুপ্তর তন্ত্রালোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও সদাশিবের উপরে পরমশিবের স্থান। আর এই পরম শিবই হলেন শ্রীঅবিমুক্তেশ্বর। শ্রীবিশ্বনাথের মতো শ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গ আর কোথাও নেই। যার উল্লেখ রয়েছে কাশীখণ্ডে 'শ্রীবিশ্বনাথেন সমং ন লিঙ্গম্/ পুরীনকাশী সদৃশো ত্রিকোটয়াম্' যিনি বিশ্বের নাথ তিনিই তো বিশ্বনাথ। তিনিই পরম সত্য। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এমনই এক তীর্থপীঠ যার সঙ্গে ইতিহাস নিবিড়ভাবে জড়িয়ে। একদা কাশী নগরীর সঙ্গে আর্যদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। বরং দ্রাবিড়রাই এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। দ্রাবিড় তত্ত্ব অনুযায়ী বারাণসী হল শিবের অঙ্গ। মানুষের বিশ্বাস, কাশীতে কারও মৃত্যু হলে শিবঅঙ্গেই তা লীন হয়ে যায়। কাশীতে মৃত্যু মানেই পূর্ণ মোক্ষলাভ যা জন্ম-মৃত্যুর স্বাভাবিক বিবর্তনের মধ্যে পড়ে না। 'কাশ্য মরণে মুক্তি'— এরকমই একটি বিশ্বাস ছিল সকলের মনে সেই সুদূর অতীত থেকে। অর্থাৎ, কাশীতে মৃত্যু হলে মানবজীবন থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ ঘটে।

কাশীক্ষেত্র অর্থাৎ মুক্তিক্ষেত্রের অধীশ্বর বাবা বিশ্বনাথের মন্দির নিয়ে গত কয়েক হাজার বছর ধরে অজস্র কাহিনী ছড়িয়ে আছে। কত অলৌকিক ঘটনা,, কত গল্প গাথা। আকবরের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন রাজা টোডরমল। তিনি ছিলেন সুবিশাল মোঘল সম্রাজ্যের দেওয়ান-ই-আসরফ। এ হল কার্যত অর্থমন্ত্রীর পদ যা ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রীর সমতুল ছিল। টোডরমলই প্রথম হিন্দু

যিনি এতবড় সাম্রাজ্যের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছিলেন। বারাণসীতে বাবা বিশ্বনাথের একটি সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে মহামান্য সম্রাট তাঁর প্রিয়পাত্র টোডরমলের সনির্বন্ধ অনুরোধে খুশি মনে সম্মতিদান করেন। আকবরের প্রধান মহিষী যোধাবাঈও মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন পবিত্র তীর্থ বারাণসীতে বিশ্বনাথের একটি স্থায়ী মন্দির গড়ে উঠুক। ব্যস যথা আজ্ঞা তথা কাজ। বর্তমান কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের ঠিক পিছনেই জ্ঞানবাপীর অনেকটা জায়গা জুড়ে বিশ্বনাথের সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ শুরু করেন রাজা টোডরমল। সেটা ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দের কথা। যে বিশ্বনাথ মন্দিরটি ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সুলতান সিকান্দর লোদি ধ্বংস করেন, হুবহু তারই রূপরেখা অনুসরণ করা হয়েছিল টোডরমল নির্মিত নতুন মন্দিরের ক্ষেত্রে।

প্রপিতামহর আন্তরিক আগ্রহে কাশী বিশ্বনাথের ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে যে মন্দিরটি প্রভূত অর্থব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল, তা ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ধূলিসাৎ করা হয়। এমনকী তিনি বারাণসীর নতুন নামকরণ করেন 'মহাম্মদাবাদ'। সময় গড়িয়ে চলে দ্রুত। আমরা এখন ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকারের রাজত্বে। অহল্যাবাই ধর্মপ্রাণা পরম শিবভক্ত। একদিন ভোরের দিকে ঘুমের মধ্যে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর ইষ্টদেবতা পিনাকপাণি মহাদেব যেন সামনেই দাঁড়িয়ে। জটাধারী। তাতে রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো। শ্বেতবর্ণ। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম। মস্তকে চন্দ্রকলা, গলায় ও কপালে রুদ্রাক্ষের মালা। সর্পের উপবীত। সর্বাঙ্গে সর্পভূষণ। রুদ্রাক্ষের কুণ্ডল। দু'চোখ অর্ধ নিমীলিত। তৃতীয় চোখ অগ্নি। হাতে অক্ষসূত্র, করোটি ও ডমরু। ত্রিশূলে পেঁচিয়ে ফণাধরা অজগর সাপ। রুদ্রমূর্তি নয়, মহাদেবের প্রশান্ত রূপ। বরাভয় মূর্তি। অহল্যাকে যেন তিনি বলছেন, তুই আমার পরমভক্ত। তোকে একটি জরুরি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই।

কী সেই দায়িত্ব? করজোড়ে জানতে চান অহল্যা। মহাদেব স্মিত হেসে বললেন, শোন অহল্যা, উত্তর বাহিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে তীর্থক্ষেত্র বারাণসীধামে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক লিঙ্গরূপে আমি সদা বিরাজমান। কিন্তু আমার সেই সাধের পবিত্র মন্দির আজ চূর্ণবিচূর্ণ। অতএব তুমি আবার সেখানে নতুন করে মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। এতে আমার ভক্তরা আনন্দলাভ করবে। বারাণসীর মাহাত্ম্যও নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা পাবে। নর্মদা নদীতে স্নানের পর কষ্টিপাথরের একটি শিবলিঙ্গ খুঁজে পাবি। বারাণসীর নতুন মন্দিরে এই শিবলিঙ্গই যেন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতেই আমি আবির্ভূত হব। এই শিবলিঙ্গই চিরদিন কাশী বিশ্বনাথরূপে পূজিত হবেন এবং তিনি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা পাবেন। সোমবার শিবঠাকুরের জন্মবার। কৃষ্ণপক্ষ। শিবঠাকুরের জন্মবারেই বারাণসীর জ্ঞানেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরে নর্মদা থেকে উদ্ধার করা স্বপ্নাদিষ্ট সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন অহল্যাবাঈ। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) পাঞ্জাবকেশরী মহারাজা রঞ্জিৎ সিং এই মন্দিরের দুটি চূড়া তামার উপর সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেন।

মহাশিবরাত্রির বারাণসী কেমন তা আমার পক্ষে ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হেসেখেলে। বড়া গোধুলিয়া মোড় থেকে পুব দিকে বরাবর দশাশ্বমেধ ঘাট পর্যন্ত যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে সেই দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে জনপ্লাবন। শিবরাত্রিতে গঙ্গাস্নান করতে আসেন নাগা সাধুরা। এবার প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভ শেষ হচ্ছে আজই। সেখানে শিবরাত্রির স্নান সেরে কোনও কোনও আখড়ার নাগা সন্ন্যাসীরা যে বারাণসীতে এসে বিশ্বনাথ দর্শন করবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রয়াগ অর্থাৎ এলাহাবাদ থেকে বারাণসী সড়কপথে ঘন্টা তিনেক। মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকে শ্রীকাশী বিশ্বনাথ মন্দির।

শিবরাত্রিতে শ্রীশ্রীকাশী বিশ্বনাথ দ্বারে পৌঁছানোই বেশ কঠিন। এটিই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রবেশের প্রধান ফটক। এই প্রবেশদ্বার পেরিয়ে একটু আঁকাবাঁকা গলিপথ ধরে মিনিট সাতেক এগলেই কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢোকার মূল সরু গলিপথের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছানো যায়। বিশ্বনাথ মন্দিরের এই প্রধান প্রবেশপথ 'বিশ্বনাথ গলি' নামেই খ্যাত। 'বিশ্বনাথ গলি' ছাড়াও শ্রীবিশ্বনাথ মন্দিরে পৌঁছানোর জন্য তিনদিকে আরও তিনটি সরু গলিপথ আছে। এই গলিপথগুলো দিয়েও মন্দিরে আসা যায়। তবে এগুলো এতই ছোট যে, দু'জন পাশাপাশি হাঁটলেও গায়ে গা ধাক্কা লাগে। একবার শিবরাত্রিতে লাইনে বেশ কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ভাগ্যের সহায়তায় কোনওক্রমে কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢোকার সেই মূল গলিপথের সামনে দাঁড়াতে পেরেছি। পাশেই দাঁড়ানো বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক ভদ্রমহিলাকে দেখে রীতিমতো অবাক হয়েছিলাম। এক যুবকের হাতে ভর দিয়ে সেই বয়স্কা ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ মাটির ওপর থপ করে বসে পড়লেন। লাইনে চাঞ্চল্য। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার জন্যই সম্ভবত ভদ্রমহিলা অসুস্থতা বোধ করেছেন। ততক্ষণে লাইন আবার চলতে শুরু করেছে। আর কয়েক পা এগলেই কাশী বিশ্বনাথের মন্দির প্রাঙ্গণ।

ওই যুবক সঙ্গে রাখা বোতলের জল বৃদ্ধাকে একটু খাইয়ে দিলেন। এরপরই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। যুবকের মুখেই শুনেছিলাম, বৃদ্ধা

তাঁর ঠাকুমা। নাম শংকরী মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে যুবকের নববিবাহিতা স্ত্রী। ওঁরা এসেছেন হুগলি জেলার এক গ্রাম থেকে। বৃদ্ধা 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' বলে আবার উঠে দাঁড়ালেন। সত্যিই কী মনের জোর! শংকরীদেবীর সঙ্গে আমার সামান্য কিছু কথাবার্তাও হল। বললেন, 'অনেকক্ষণ উপোস করে আছি। হঠাৎ শরীর খারাপ লাগছিল। গতবছর কাশী বিশ্বনাথের কাছে মানত করেছিলাম নাতির ভালো বিয়ে দিতে পারলে শিবরাত্রিতে এসে বাবার মাথায় জল ঢালব। খুব ভাল নাত-বউ হয়েছে। তাই এ শরীর নিয়েও বিশ্বনাথ দর্শনে এসেছি। দেখলে তো বাবা বিশ্বনাথের নাম নিতে নিতে কেমন উঠে দাঁড়ালাম!' বৃদ্ধার কথা শুনে মনে হল, একেই বুঝি বলে প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী।

প্রতিদিন ভোর ৩টে থেকে ৪টে পর্যন্ত কাশীবিশ্বনাথ মন্দিরে যেমন মঙ্গলারতি হয়, শিবরাত্রি উপলক্ষে তার কোনও হেরফের ঘটে না। তবে এ দিনের গুরুত্ব আলাদা বলে মঙ্গলারতির মাথাপিছু টিকিটের খানিকটা মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এদিন বাবা বিশ্বনাথকে গর্ভগৃহে এসে সরাসরি দর্শনের সময়সীমাও কিছুটা বাড়ানো হয়। রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত সাধারণ দর্শনার্থীরা গর্ভগৃহে প্রবেশের অনুমতি পান। শিবরাত্রির চার প্রহরে চারবার গর্ভগৃহে বিশেষ আরতি ব্যবস্থা করা হয়। আর এই বিশেষ উৎসব উপলক্ষে কাশীবিশ্বনাথের শৃঙ্গার সত্যিই নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে। ভোগের বৈচিত্র্যও উল্লেখ করার মতো।

কাশী বিশ্বনাথের গর্ভগৃহ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে মোটামুটি ১০০ বর্গফুট। গর্ভগৃহের এককোণে রুপোর তৈরি কমবেশি ১৬ বর্গফুটের চৌকো ছোট্ট একটি অগভীর কুণ্ড। আর এই কুণ্ডেই কাশী বিশ্বনাথের সেই স্বর্ণময় জ্যোতির্লিঙ্গ। স্তূপাকার ফুল বেলপাতার মধ্যে জ্যোতির্লিঙ্গের শুধু উপরিভাগই দৃশ্যমান। এক্ষেত্রে রামেশ্বরম মন্দিরের দিকে যদি একটু দৃষ্টি ফেরাই তাহলে দেখতে পাব, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের তুলনায় রামেশ্বরম মন্দিরের আয়তন অনেক বেশি। রামেশ্বরম মন্দিরের গর্ভগৃহ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ২৪০০ বর্গফুট। আর গর্ভপ্রাঙ্গণটিতে কয়েক হাজার তীর্থযাত্রী অনায়াসে দাঁড়াতে পারেন। সমগ্র মন্দিরটি কয়েক একর জমির উপর। পূর্বদিকের ১২৬ ফুট উঁচু গোপুরমাটি তো দেখার মতো, আর এই মন্দির জগদ্বিখ্যাত।

কিংবদন্তি, রামেশ্বর মন্দির রামায়ণ কালের। জনকনন্দিনী সীতা সমুদ্রসৈকতের বালি দিয়ে শিবলিঙ্গ গড়েছিলেন। সেই শিবলিঙ্গকে পুজো অর্চনা করেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র। যিনি রামের ঈশ্বর তিনিই শ্রীরামেশ্বর। প্রাচীনকালে মুনি ঋষিদের আশ্রমের খড়ে ছাওয়া এক কুঁড়েঘরে শ্রীরামচন্দ্রের স্থাপিত এই শিবলিঙ্গ পুজো অর্চন পেতেন। রামেশ্বর মন্দির বলতে সেটিই ছিল সেই যুগের ভক্তদের যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল।

রামেশ্বরম মন্দিরের নথিপত্র ঘেঁটে যেটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে, কোনও ভারতীয় রাজা নন, শ্রীরামনাথস্বামীর মূল লিঙ্গের জন্য প্রথম গ্রানাইট পাথরের উপযুক্ত একটি গর্ভগৃহ নির্মাণ করেন শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডি অঞ্চলের প্রবল পরাক্রমশালী রাজা পরাক্রম বাহু। সময়টা দ্বাদশ শতাব্দী। আরও পরে রামেশ্বর মন্দিরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় রামনাথপুরমের ধার্মিক রাজা তিরুমালাই সেতুপতি ও তাঁর পুত্র রাজা রঘুপতি সেতুপতির আমলে। এই মন্দিরের উন্নতিকল্পে মহারাজা মুথুরা মলিঙ্গে সেতুপতি, দালাভাই সেতুপতির অবদান উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে রামনাথ পুরের আর এক রাজা ভাস্কর সেতু পতির কথাও বলা প্রয়োজন। তিনিও রামেশ্বর মন্দিরের সার্বিক উন্নতিতে বিস্তর সহায়তা করেন। রামেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহে যিনি বিরাজমান, সেই শ্রীরামেশ্বর লিঙ্গটি কিন্তু জ্যোতির্লিঙ্গ নন। সর্বসাধারণের বিশ্বাস ইনি শ্রীরামচন্দ্র পূজিত সেই শিবলিঙ্গ। তবে এই মন্দিরেও জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে। শ্রী রামনাথস্বামীর গর্ভদেউল প্রাঙ্গণেই আর একটি ছোট মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছেন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের সঙ্গে রামেশ্বরম মন্দিরের একটি মস্ত তফাত নজরে পড়েছে। যে কোনও তীর্থযাত্রী কাশী বিশ্বনাথের মাথায় সরাসরি দুগ্ধ কিংবা গঙ্গাজল ঢালতে পারেন। এমনকী এই জ্যোতির্লিঙ্গকে স্পর্শও করা যায়। কিন্তু শ্রীরামনাথস্বামীর মূল গর্ভগৃহে একমাত্র এই মন্দিরের পূজারিরা ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার নেই। শ্রীরামেশ্বর লিঙ্গকে কোনও তীর্থযাত্রীই স্পর্শ করতে পারে না। তীর্থযাত্রীদের আনা পবিত্র গঙ্গাজল কিংবা দুগ্ধ পূজারিদের হাতে তুলে দিতে হয়। এরপর ওই পূজারিরাই তা নিবেদন করেন শ্রীরামনাথ স্বামীকে। বারাণসী থেকে অনেক ভক্তই গঙ্গাজল নিয়ে আসেন রামেশ্বরম মন্দিরে। মহাশিবরাত্রিতে রামেশ্বরম মন্দিরে অতিবাহিত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। চারপ্রহরের পুজো-অর্চনা দেখেছি। শ্রীরামেশ্বর অনাদি লিঙ্গ। অতএব তাঁর অভিষেক ও পুজো যে অন্যমাত্রা লাভ করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যিনি পুজো করছেন উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, 'হে দেব! তোমার আজ্ঞা ক্রমে আজ আমি এই ব্রত সমাপন করলাম। হে স্বামিন! যেহেতু ব্রত ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে তুমি সন্তুষ্ট হও। হে শিব! হে শংকর! হে সর্বাত্মন! আমার উপর কৃপা কর।'

'পঞ্চদ্রব্যৈশ্চ প্রথমোং পূজনীয়ো মহেশ্বরঃ।' প্রথমে পঞ্চামৃত দিয়ে মহেশ্বরের পুজো। তারপর তাঁর উপর জলধারা প্রদান। একদিকে অষ্টোত্তর শতমন্ত্র পাঠ, অন্যদিকে এই জলধারার সাহায্যে নির্গুণ অথচ গুণরূপী শিবের পুজো। চন্দন, অখণ্ডিত তণ্ডুল, তিল— এই সকল বস্তু নিবেদন করে দেবাদিদেবের পুজো-অর্চনা। আটটি নামমন্ত্রের সাহায্যে শিবলিঙ্গের উপরিভাগ পুষ্প অর্পণ পক্রিয়ার শুরু। এই আটটি নাম হল— শর্ব্ব, ভব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম এবং ঈশান। প্রতিটি নামের আগে 'শ্রী' যুক্ত করা অবশ্য কর্তব্য।

শিবরাত্রি উদযাপনে গীত, বাদ্য, নৃত্য ও শিবের গুণগান সমৃদ্ধ নানা ধরনের সংগীত হয়। দ্বিতীয় প্রহরেও গীত, বাদ্য কিছুমাত্র কমে না। বরং রাত যত গভীর হয় রামেশ্বরম মন্দিরে উপস্থিত ভক্তদের মন ভাববিহ্বল হয়ে পাড়ে। গর্ভদেউলের পরিমণ্ডলই সেই পরিবেশ রচনায় সহায়তা করে। রামেশ্বরম মন্দিরের চারপ্রহরের পুজো শেষ হতে প্রায় ভোর। রামেশ্বরম মন্দিরেও অনেক তীর্থযাত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। কেউ মানত করেছেন, কেউ মানত পূরণে শ্রীরামনাথস্বামীকে গঙ্গাজল নিবেদন করতে এসেছেনে। এইসব তীর্থযাত্রীর চোখে-মুখে অপার আনন্দ লক্ষ্য করেছি। মহাশিবরাত্রিতে সেই টুকরো টুকরো সুখানুভূতিই পরম প্রাপ্তি। ❑

মহাজগতের অন্তরালে থাকা মহাশক্তিই হচ্ছেন জগদ্ধাত্রী

অরূপ ভট্টাচার্য

কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। উৎসবের রং বাঙালির হৃদয়কে প্রতি মুহূর্তেই ছুঁয়ে যায়। উৎসবের আনন্দে ঢাকা পড়ে যায় জীবনের দুঃখ-হতাশা। কথিত আছে পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্রসহ মহাজগৎকে যিনি ধারণ করে আছেন তিনিই মা জগদ্ধাত্রী। আর এই মহাজগৎধারিণী জগদ্ধাত্রী মায়ের ধুমধামসহকারে আরাধনাকে উৎসবে পরিণত করে সারা পৃথিবীতে যে শহর নিজেকে মেলে ধরেছে তার নাম চন্দননগর। এককালে প্রাচীন এই শহরের পরিচিতি ছিল ফরাসি উপনিবেশ হিসেবে। বর্তমানে চন্দননগরের পরিচিতি জগদ্ধাত্রী পুজো আর বিখ্যাত আলোর মাধ্যমে। কথিত আছে রহস্যময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। মহাশূন্যে ভাসছে মানুষ, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী সবই। প্রতি মিনিটে প্রতি মুহূর্তেই জীবের মৃত্যু হচ্ছে। অথচ পৃথিবী কখনও জীবশূন্য হয়নি। একই সঙ্গে কয়েক হাজার গ্রহ-নক্ষত্র লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেলেও কেউ কাউকে স্পর্শ করেনি। এই মহাজগতের অন্তরালে রয়েছে অদ্ভুত এক মহাশক্তি। আর সেই মহাশক্তিই হলেন মা জগদ্ধাত্রী। জগদ্ধাত্রী মা দুর্গার আরেকটি নাম হলেও দুই মায়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। মা দুর্গা দশভুজা হলেও জগদ্ধাত্রী চতুর্ভুজা। দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী হলেও জগদ্ধাত্রী কবিন্দ্রাসুর নিসূদিনী যা দেবী দুর্গার সঙ্গে ছলনা যুদ্ধের শেষ রূপ ছিল। শুধু পার্থক্যই নয়, মা দুর্গার সঙ্গে জগদ্ধাত্রীর মিলও রয়েছে। কারণ দুজনেই সিংহবাহিনী। চন্দননগরে ঠিক কোন্ বছরে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয় তা নিয়ে সঠিক তথ্যভিত্তিক কোনও প্রামাণ্য নথি পাওয়া যায়নি। তবে গবেষক ও চন্দনগর এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে শোনা বক্তব্য অনুযায়ী প্রায় সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে ফরাসি উপনিবেশের সময় থেকেই হয়ে আসছে জগদ্ধাত্রী পুজো। লোকমুখে প্রচারিত আছে— নবাব মীরকাশিমের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুঙ্গের দুর্গে বন্দি হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান অপরাধ ছিল তিনি খাজনা দেননি। বেশ কয়েক দিন ধরে জেলে বন্দি থাকার পর দুর্গা পুজোর নবমীর দিন কারামুক্ত হন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেই তিনি নৌকা করে কৃষ্ণনগরের দিকে যাত্রা শুরু করেন। ওই সময়ে রাজা মনে মনে ভাবছিলেন নিজের দেশে ফিরেই মা দুর্গার পায়ে অঞ্জলি দেবেন। কিন্তু তখনও অনেকটা পথ বাকি। তার উপর নদীতে জোয়ারভাটার প্রবল টান। তাই বাড়ি ফিরতে ফিরতে দশমীর বাজনা বেজে যাবে। গঙ্গায় দুলে দুলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নৌকা এগিয়ে চলেছে। নায়েব, দেওয়ান থেকে শুরু করে রক্ষী সকলেই ছিলেন রাজার সঙ্গে। নৌকায় যাওয়ার সময়ে বিষণ্ণ মনে ঘুম এসেছিল রাজার। ক্লান্ত শরীরে চোখ বন্ধ করতেই স্বপ্নে দেখা দেন মা জগদ্ধাত্রী। স্বপ্নে এসে নিজেই রাজাকে প্রশ্ন করেন, কোথায় যাচ্ছিস? দেবীর প্রশ্নে কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়েন রাজা। তখন মা জগদ্ধাত্রীই নাকি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নৌকা থেকে নেমে চন্দননগরে ওঠান নির্দেশ দেন। বলেন, যা চন্দননগরে গঙ্গার ধারে একটি ফাঁকা মাঠ আছে সেখানে আমার প্রতিষ্ঠা কর। আমি সেখানেই আছি। তারপর ঘুমের মধ্যেই মা মিলিয়ে যান। ঘামে ভিজে ঘুম ভাঙার পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে রাজামশাই উঠে দাঁড়াতেই কী হয়েছে রক্ষীরা জানতে চান। রাজা মাঝিকে বুঝিয়ে দেন তিনি এখানেই নামতে চান। চন্দননগরের চাউলপট্টি ঘাটে নৌকা লাগিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দেবীর স্বপ্নাদেশে দেওয়া ফাঁকা মাঠে ছুটে যান। তাঁর দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরিকে নিয়ে চন্দননগরে চাউলপট্টিতে মা জগদ্ধাত্রীর পুজো শুরু করেন। চন্দননগরে চাউলপট্টির মা জগদ্ধাত্রীই আদি মা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজেই এই মায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর থেকেই বাঙালির সেরা উৎসব শারদোৎসবের ঠিক এক মাস পরেই চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো হয়ে আসছে। দুর্গা পুজোর দশমীর দিন থেকেই চন্দননগরে শুরু হয় জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রস্তুতি। শুরু হয় কাঠামো পুজো। কিছু পুজো কমিটি আবার লক্ষ্মী পুজোর দিনে কাঠামো পুজো করে। দুর্গা পুজোর মতোই ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিন ধরে জগদ্ধাত্রী পুজো চলে। প্রথমে এই পুজো জমিদারদের হাতেই ছিল। তাঁরাই পুজো করতেন। পুজোর আনন্দে সাধারণ মানুষ থাকতেন কেবলমাত্র দর্শনার্থীর ভূমিকায়। পরবর্তী সময়ে ফরাসিরা চন্দননগরে উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্য হাজির হওয়ার পরেই এলাকার ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে পুজো শুরু করেন। যার জন্য আজও চাউলপট্টির পুজোকে চন্দননগরের আদি পুজো বলা হয়। পরবর্তী সময়ে কাপড় পট্টি ও ময়দা পট্টির ব্যবসায়ীরা আলাদা করে পুজো শুরু করেন। পরে এই পুজো ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে এই চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর পুরসভা এলাকায় ছোটো বড় মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিনশটি পুজো হচ্ছে। পুজোর পাশাপাশি চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসানের শোভাযাত্রার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। তাই দশমীর বিকাল থেকে সারারাত ধরে লরিতে চাপিয়ে বিসর্জন ঘাটে নিয়ে যাওয়ার আগে পুজো কমিটিগুলির থিমের শোভাযাত্রা দেখার জন্য প্রতি বছরই মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। ❑

> এই মহাজগতের অন্তরালে রয়েছে অদ্ভুত এক মহাশক্তি। আর সেই মহাশক্তিই হলেন মা জগদ্ধাত্রী। জগদ্ধাত্রী মা দুর্গার আরেকটি নাম হলেও দুই মায়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। মা দুর্গা দশভুজা হলেও জগদ্ধাত্রী চতুর্ভুজা।

কবিতাঙ্গন

মা
আশা রানী দেবী

মায়ের কোলে প্রথম শিশু আনন্দে বিহ্বল
চারিদিকে বাজে শঙ্খ শোনে উলুধ্বনি রব।
হাজার ব্যথার মাঝে মা প্রথম পরশ পায়
সে ভুলে যায় সকল কষ্ট হৃদয়ে পুলক জাগায়।

তিলে তিলে তাকে যখন বড় করে তোলে
হাসিখুশির দিনগুলি যায় অতিদ্রুত চলে।
স্নেহের আলো আর ভলোবাসায় বড় হয়ে শিশু
সব ভুলে যায় মনে হয় তার মা করেনি কিছু।
চাওয়া পাওয়া বাড়তে থাকে হয় না কভু শেষ–
যতই চায় ততই পায় নেই যেন তার শেষ।

এমনি করে দিন চলে যায় কাটে বছর মাস
দু'যুগ পরে হিসেব করে কি পেয়েছি আজ।
চাওয়া পাওয়ার হিসেবে যে বড়ই গরমিল
খেদে ভরা মন কেঁদে কয় কি করেছিস তুই?
কিছুই তো পাইনি আমি অন্যসবার মত
কেন তুই পারলি না দিতে অতোশত?

মা হেসে কয় সত্যিতো তাই কি দিয়েছি আমি
দেবার মত কিছুইতো নেই,
হৃদয় জুড়ে আছে শুধু ভালোবাসার খনি।
বুকভরা এ ভালোবাসার আশিস নিয়ে তুমি
সারাটি জীবন সুখের রবে এ'ভেবেছি আমি।

এটা চাই - ওটা চাই আরো কত চাই-চাই
এ চাওয়ার নেই কোন শেষ।
সীমাহীন চাওয়া শুধু বেড়ে চলে প্রতিদিন
অসহায় মা, কেঁদে বলে—
বহিতে পারি না আর পাষাণ হৃদয় ভার
শেলসম প্রতিদিন অন্তরে বাজে।
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, কটূক্তিতে ভরা দিন চলে যায়
সময়ের স্রোতের ন্যায় কেহতারে রুধিতে না পারে।

মনের কষ্ট ব্যথা প্রকাশিতে না পারে কোথা
অন্তরে ধিকিধিকি জ্বলে।
তারপর দু'হাত তুলি ঊর্ধ্বপানে চেয়ে
মা কেঁদে কয়— হে দয়াময় রাখ তুমি
মোর সন্তানে সুখের সাগরে।
এতটুকু যন্ত্রণা ব্যথা আর বঞ্চনা
দিওনাকো ক্ষণিকের তরে।
সব জ্বালা বঞ্চনা ব্যথা আর যন্ত্রণা
রেখো তুমি আমার তরে।
কালের নিয়মে হায় অন্তিম সময় আজ
দরজায় কড়া যে নাড়ে
শেষ বিকেলের ফুল টুপকরে ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুক থেকে।
মিলালো সূর্যরশ্মি অস্তমিত আভাছাড়ি
বেদনার হাসিটুকু রয়ে গেল ঠোঁটের কোণে
ভালো রেখো— ভোলো থেকো
হৃদয়ের আর্তিটুকু দিয়ে গেল সন্তানের তরে।

সূর্যমুখী
পূরবী পাল

সূর্যমুখী, সূর্যমুখী, খুঁজে বেড়াই তোমার তরে—
মুখ লুকালে কোথায় তুমি? কোন গাছের আড়ালে।
তোমায় দেখবে বলে সূর্যিমামা উঠছে মেঘের ফাঁকে,
লজ্জা কিসের? মুখ তুলে চাও— হলুদ বরণ তোমার
যে তাই দেখাও দিকে দিকে।
রক্তিমাভা আলোয় ভরে ওঠে চারিদিক–
ঘোমটাখানি খুলে তুমি দেখো ওপরদিক।
তোমার খেলার সাথি ফুলের দল
আছে তোমায় ঘিরে—
সূর্য আলোয় বিকশিত তারাও ধীরে ধীরে।
সূর্যি মামার প্রিয় তুমি, হলুদ তোমার রং—
অন্য সকল ফোটা ফুলের হাজার রং বেরং।
তোমার রংয়ের বাহার ভরিয়ে তোলে
বাগান চারিদিক—
রামধনুরই মত যেনো করে ঝিকিমিক।
আলো দেবে তোমায় বলে, সূর্য ওঠে আকাশপর
হাসিভরা মুখখানা দেখাও চরাচর।
সূর্যমুখী, সূর্যমুখী, তোমায় দেখি অন্তর ভরে—
খুশির আলোয় ছেয়ে দাও
সারা জগৎ জুড়ে।

পূজা ভাবনা

Ma Durga and Sati

Antasree Dey (Atri), Age: 11, Grade: 6

Sati: After years of meditating, King Dakkho and Queen Proshouti finally deserved a daughter. One night a light appeared from the sky! The king was surprised to see Maa Kali. She kindly said, “Oh king you surely deserve a reward, what do you want”? The king replied, “I hope this is not too much but my wife and I want a daughter”. As you wish, “I'll come to earth myself and take the form of your daughter”, she said. That morning the king returned to the palace with great news, he couldn't wait to tell the queen and the rest of the kingdom. When he started to enter the palace trumpets and instruments were being played. Queen Proshouti was so surprised that his loyal husband had finally returned from almost a decade of meditations. As the king went to his royal chamber he saw the Queen looking prettier than ever. He told her about everything and she was delighted. Before midnight, the queen’s servants lit candles all around her chamber and the palace hoping the baby will arrive soon. A few hours later all the servants rushed to her chamber, seeing the queen holding an infant in her hand. The king named her Sati.

As years passed, Sati grew up and she also grew her fond of loving Lord Shiva. Not only that but she was a very loving and kind princess. One-day Sati's mom said, “After you get married I hope your fond of Lord Shiva still goes on”. The king did not agree with letting his only daughter marry. Only because secretly he knew it was Ma Kali. After a few years, Sati was almost a teen and she wanted to meet Lord Shiva so badly. One day she captured a white dove and released it saying that she really wanted to marry Lord Shiva. Now that Sati was already a teenager she bathed in the pond every night and worshipped him. Meanwhile, in heaven, Brahma and Vishnu were having a chat about Lord Shiva marrying Sati. One night when Sati went to worship Lord Shiva,as usual,he suddenly appeared in front for her. Sati was so delighted that she cried out of happiness. Lord Shiva asked for the proposal to marry him. Sati happily answered that her father will have to agree with the proposal. That morning she told her mom and all her cousins about the incident. When informed her father ordered to stop worship Lord Shiva anymore because he does not want Sati to marry anyone. Now that Sati was so in love with Lord Shiva she didn’t care about the consequences of not listening to her father. She praised him so much she could sacrifice mostly anything for him. After a few days, the king Dakkho was ready for Sati’s marriage but not with Lord Shiva. So he sent guards to the front gate aware of that Lord Shiva might come to postpone the marriage. The king knows that Lord Shiva has the power to destroy the world. Eventually, Lord Shiva appeared overcoming all barriers and Sati put a garland of flowers around his head. The king was so furious that he yelled & squealed to Sati in front of the demigods, demi priests and other Gods like Indra Dev and Chandra Dev. For this reason and her anger at not letting her worship came true Sati decided to burn herself. However, later on, she reincarnated as a Goddess Parvati, the wife of Lord Shiva.

Ma Durga: Mahishasura, the Demon King wanted a boon from Lord Brahma that no God or any men could defeat him. Lord Brahma had granted his wish on one condition that he will have to use his boon properly, but the demon king did not pay attention. He started attacking Gods and Goddesses in the heaven and taking innocent people to work for him. All the Gods and demigods were anxious and scared of his power and evil acts. They were not finding any way out how to punish him because of his immoral power to live. All God and Goddess gathered together to Lord Brahma for his advice on this matter. They gathered all of their special power together to incarnate the maha-shakti invincible Goddess Ma-Durga. When Lord Brahma was incarnating Saraswati, Lakshmi and Parvati to a ten-armed super-goddess Devi Durga, she was receiving powers from the other Gods. Lord Shiva gave her trident, Lord Vishnu gave her Sudarshan Chakra, and Lord Brahma himself gave her his Kamandalam. Devi-Durga was also combined with a conch shell, bow and arrows, lotus, sword, and blessing hand. Later the battle gets started on an epic battlefield where every time Mahishasura used a weapon Ma Durga’s moha-shakti defeated his. Eventually Mahishasura was getting weaker and at last, he appeared as a furious buffalo demon but Ma-Durga’s trident caught him off-guard on her feet. Finally, when wounded Mahisharura acknowledged his mistakes Ma-Durga forgave his sin by saying that he will share worship along with her deities. ❑

Joy Ma Durga

The Essence of Durga Puja

Sulov Deb

From Monday October 14th to Friday October 18th are the days where everyone comes together and celebrates the most festive puja of the year. Durga puja, the most acclaimed annual puja with history found earlier than the all the way to today. For more centuries than we have been counting time, the bengals have retained this cultural celebration which encapsulates the birth of Maa Durga, her fight for us and victory against Mahishasura and injustice. Her strength to fight for what is right, for justice is celebrated and uplifts us, our humanity, and moral standards. Durga puja is a time for everyone to pray and receive blessing from Maa Durga to give us strength to fight on. Whether it is a life crisis or just another everyday battle Maa Durga's blessing is for those with strength and persistence just as Ravana had. With it's origins of practice actually originating from the first time Ravana prayed to obtain her blessings it's true essence of practice symbolized by Ram and his dedication in defeating Ravana by attempting to sacrifice his eye in order to complete the ritual.

In my brief piece Maa Durga I hope to shine a light on what durga puja is with the intention of reminding everyone the origins of the celebration and a homage to our ancestors and our culture. ❑

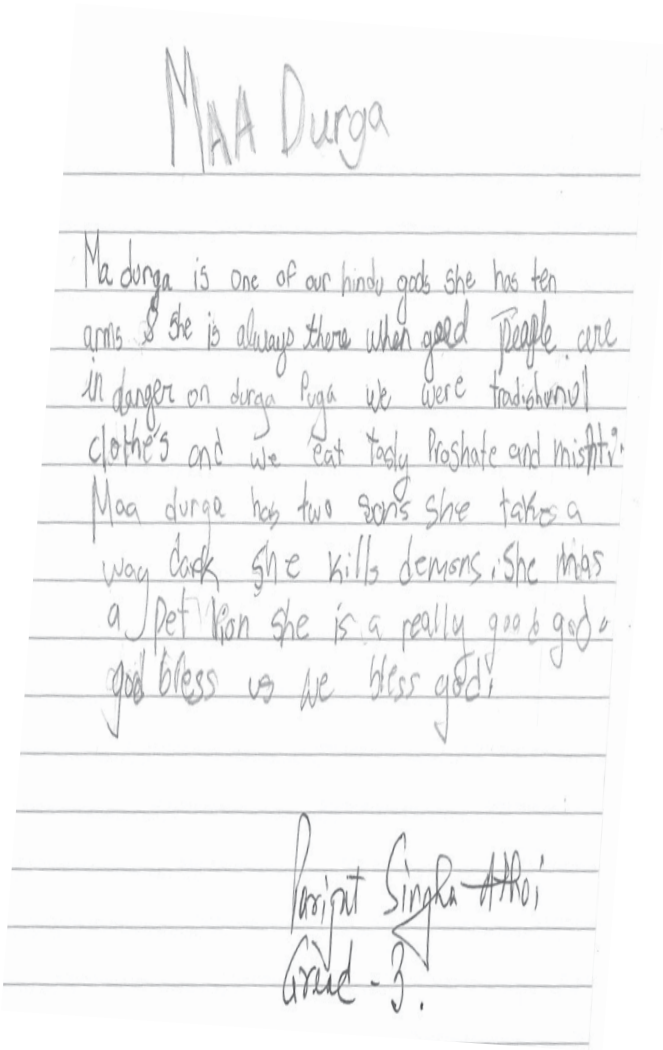

MAA Durga

Ma durga is one of our hindu gods she has ten arms & she is always there when good people are in danger on durga Puga we were tradishonal clothe's and we eat tasty Proshate and mishti. Maa durga has two sons she takes a way dark she kills demons. She has a pet lion she is a really good god. god bless us we bless god!

Parijat Singha Athoi
Grad - 3.

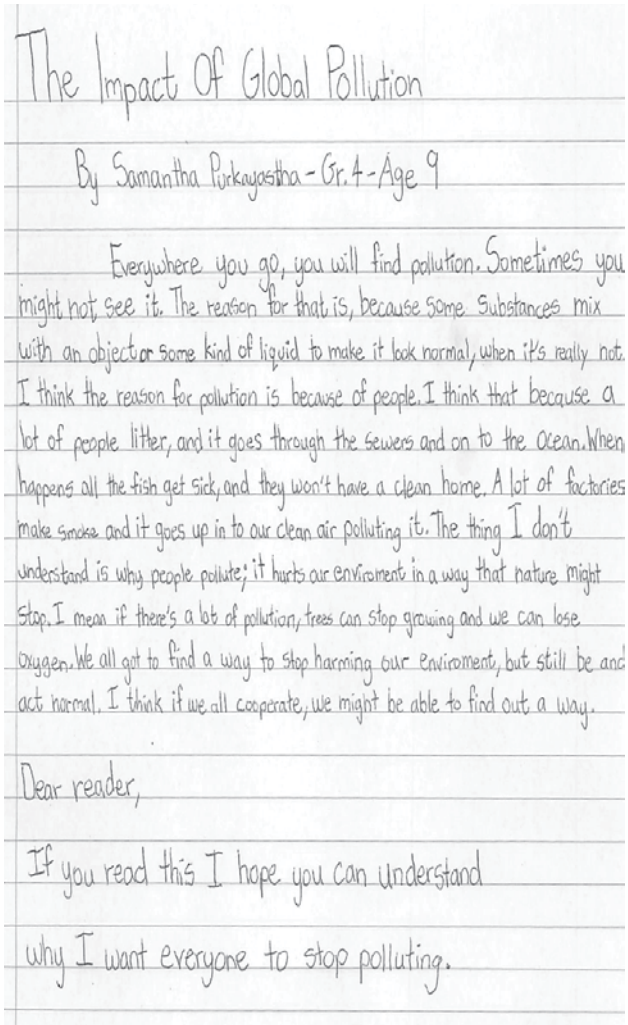

The Impact Of Global Pollution

By Samantha Purkayastha - Gr. 4 - Age 9

Everywhere you go, you will find pollution. Sometimes you might not see it. The reason for that is, because some substances mix with an object or some kind of liquid to make it look normal, when it's really not. I think the reason for pollution is because of people. I think that because a lot of people litter, and it goes through the sewers and on to the ocean. When happens all the fish get sick, and they won't have a clean home. A lot of factories make smoke and it goes up in to our clean air polluting it. The thing I don't understand is why people pollute; it hurts our enviroment in a way that nature might stop. I mean if there's a lot of pollution, trees can stop growing and we can lose oxygen. We all got to find a way to stop harming our enviroment, but still be and act normal. I think if we all cooperate, we might be able to find out a way.

Dear reader,

If you read this I hope you can understand why I want everyone to stop polluting.

ma Durga

Rhitoja Singha Hiya

Grade - 5

Ma Durga is our gades and we look up to her. She has ten arms five on the left and five on the right. She taks away all the Darknees from the Demons. She look's up for the good She saves us. She helps us on stuf We look up to her Becuse she is our god of life.

Ganesh

Ganesh is a hindu god. Ganesh has three names are Vinayaka and Ganapati. Ganesh's parents are Shiva (father) and Parvati (mother). Ganesh usually holds an axe, he holds an axe because to cut off all three attachments of life. Ganesh has a face of a elephant and he has four arms. Ganesh is the god of wisdom and learning, he also is the remover of obstacles. Ganesh has a brother, his name is Kartikeya. One Ganesh mantra is "Om Shri Ganesaya Namah, Om Shri Ganesaya". This is a few things about our religious leader Ganesh.

Grade 9
Arik Dutta

Religious Leaders

The religious leader I will be writing about is Ramakrishna. He was born on February 18th, 1836, he was born into a poor Brahman family. He was born in Hooghly which is now known as Hugli. He is a religious leader because he is the founder of Ramakrishna Mission, this organisation is used for schools of religious thought and much more. Growing up Ramakrishna had very little formal schooling. Ramakrishna Spoke Bengali and knew English and Sanskrit. Then he would go on to marry Sarada Devi. And for the rest of his life devoted his life to god. Ramakrishna died at age 50 on August 16, 1886 in kolkata, India. This is the religious leader I chose Gadadhar Chatterji also known as Ramakrishna.

Grade 10
Aungkan Dutta

The story of Durga Killing Mahishasura.

Sam Paul. Age 9, Grade-4

1. Mahishasura's wish was no man or animal could kill him. Brahma granted him that wish and told him "a women will be the end of him."

Mahishasura thought he was invincible. (He belived no women in the world could cause him harm). He attacked trilok. He tried to capture Indralok.

The Gods decided to wage a war on mahishasura. Lord Vishnu decided to create a female form to defeat him. So, Brahma, Vishnu and shiva combined all of their powers together to give birth to Durga.

Durga then fought Mahishasura. Mahishasura changed into different animals but when he changed back to a buffalo Durga stabbed him with her trident and that's the end of him.

Sam Paul. Grade-4

Date: August 8th 2018

Name: Sourov
Grade: 8

All About Devi Durga

Devi Durga is one of the most essential and one of the most powerful goddess known from the Sanatan Dharma. Ofcourse all of the goddesses are essential in life but I think or in my opinion I beleive that Maa Durga stands out the most. What does Maa Durga do? What part of life does she control? She controls the supply of strength and energy on us humans. Without energy or strength we would not be able to survive because energy and strength are one of our 5 basic needs. Maa Durga is the most popular incarnation of Devi and she is also reffered to as Durgatinashini. Devi Durga is also the spouse of lord Shiva. Some of the weapons or untensils Devi Durga uses are the Bow and Arrows, the Sword, the Conch Shell and many more. First of all, the Bow and Arrows represent/demonstrates the kinetic and potential energy created by Devi Durga. Second of all, the sword mostly represents and symbolizes the knowledge that Maa Durga has. Lastly, the Conch shell symbolizes the Pranava a synonym for the abstract word, "Om". Do you think I got some of the major points about the goddess of strength, power and energy? I am more than confident that I did. Thank you for taking your time and reading my short paragraph on Devi Durga and lastly I would like to thank Nobonita Purkayastha, Mihir Das, Shemal Bhattacharjee and Ashish Das for helping me strive to be a better person.

Importance Of Regular Prayer

By Shoptodeep Purkayastha - Gr 7 - Age 11

Every religion has their own prayer. Us hindus' way is to close our hands to our chest, close our eyes, and sing Sanskrit prayers. Muslims' way is to lie down in front of Allah. Christians' way is to just move their fingers on their chest, showing it to Jesus Christ. And Buddist prays by meditating.

Every religion prays, because we want to show respect to the powerful god. Earlier before, all Muslims pray to Allah, Christian pray to Jesus Christ, and Hindus pray to many gods, such as- Krishna, Shiva, Rama, Hanuman, Ganesh, Saraswati, Laksmi, Karthik, Vishnu, Brahma and obviously, Ma Durga. The only question is why do we need to pray to god? Why do we need to pray to god? Why do we need to show respect to god?

We should respect to god, because we need to survive. Hindus' god Indra gives us rain, Saraswati gives us knowledge, and Ganesh gives success. Allah gives Muslims the moon, Buddha gives peace, and Christ gives Christians freedom. It is important to pray everyday. We learn how to pray to god by our parents. Hindus learn a book called Bhagabhat Gita, Muslims learn Quran, and Christian learn The Holy Bible.

Now you know the importance of regular prayer.

Our Religion and Scriptures

The name of our religion is Sanatan Dharma. Sanatan means eternal which was in the past, is in the present and will be in the future.

Our Scriptures

The Veda is our main Scripture. Veda means Knowledge. The Srimad Bhagavad-Gita is one of the most important scripture. We have some scriptures besides the Veda and the Gita, such as the Puranas, the Ramayana, the Mahabharata, the Upanisads etc.

Durga Puja is our main festival. We celebrate Durga Puja. We have lots of fun at Durga Puja.

Debosmita Banerjee
Grade 1

"মা দুর্গা"

দুর্গা শক্তির দেবী। সকল শক্তির মিলিত রূপ দুর্গা। তাঁর অনেক নাম, অনেক রূপ। যেমন-মহামায়া, ভগবতী, চন্ডী, মঙ্গলাক্ষী ইত্যাদি। দুর্গম নামে এক অসুরকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। তিনি জীবের দুর্গতি নাশ করেন। এজন্য তাঁর আরেক নাম দুর্গতিনাশিনী।

দুর্গার তিনটি চোখ। এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। দেবী দুর্গার দশ হাত। তাই তাঁর আরেক নাম দশভুজা। দশ হাতে তার দশটি অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়ে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

দুর্গাকে সর্বমঙ্গলা বলা হয়। কারণ তিনি সকল প্রকার মঙ্গল করেন।

পৃথ্বিরাজ রাজাজী
গ্রেড ৫

কার্বন ট্যাক্স

– সার্বভৌম রায় মজুমদার (ক্লাস ৫)

একদিন খবরের কাগজে একটা শব্দ দেখলাম 'CARBON TAX'. বাবাকে [redacted] জিজ্ঞাসা করলাম কার্বন ট্যাক্স কি ? বাবা বলেছিল গুগলে দেখতে। আমি গুগল করে যা দেখলাম তা অনেক কঠিন, কিছুই বুঝলাম না। তখন ~~বাবা~~ আমাকে সহজ ভাবে 'কার্বন ট্যাক্স' কি তা বুঝিয়ে বলল। আমাদের টাকা থেকে একটা অংশ আমরা সরকারের কাছে জমা দেই। সেই জমা টাকা খরচ করে সরকার অনেক কাজ করে। যেমন, হাসপাতাল, স্কুল, পার্ক, রাস্তাঘাট, এইসব। এই জমা দেয়া টাকাকে ট্যাক্স বলে আর কার্বন হল একটা গ্যাস। পেট্রোলিয়াম, গ্যাস, কয়লা এগুলো পোড়ালে কার্বন বের হয়ে বাতাসে মেশে। বেশি কার্বন বাতাসে মিশলে পরিবেশ দূষন হয়। তাই মানুষ যেন পরিবেশ দূষন কম করে তার জন্যে কার্বন ট্যাক্স ধরা হবে। যে যত বেশি বাতাসে কার্বন ছড়াবে, সে তত বেশি ট্যাক্স দেবে। তাকেই বলা হবে কার্বন ট্যাক্স। তাহলে মানুষ চেষ্টা করবে যেন কম কার্বন বাতাসে ছড়ায়। এভাবে পরিবেশ দূষন কম হবে।

By: Sarbabhouma Roy Majumder
Grade 5

Why we are Hindus

We are Hindus because we follow the Hindu Dharma. There are some basic things in Hinduism. They are : 1. Hindus believe in one Supreme God. 2. Hindus believe in pre-life and after-life. Our soul never dies. It takes a new life. 3. Hidus believe in non-violence. 4. Hindus believe in avatars of God. 5. Hundus believe in many powers of God in many forms with many names, such as Shiva, Durga, Saraswati. Since we believe in these basic things of Hindu Dharma, we are Hindus. In fact, the word Hindu comes from Sindhu. In old sanskrit books, india was called "The land of Sapta Sindhu". In ancient Sanskrit, 'S' was pronounced as 'H'. In this way, people of "The land of Sapta Sindhu" were known as Hindus.

Significance of Durga Puja

Abeer Das
Grade 8

Durga Puja is the main festival of Hindus which is celebrated all over the world. The festival is also known as Navratra. Durga Puja countinues for 5 days and each day is called by a different name. Durga Puja is one of the most popular festivals of Bangladesh and India in which Lakshmi, Saroswati, and Durga is referred as Ma.

A religous frenzy goes through the country during these sacred days of Navratra. While fast, feast and worship of Goddess Durga continues for ten days. Durga Puja is largely celebrated with much happiness and cheerfulness during the last four days (Maha Saptami, Maha Ashtami, Maha Navami and Dashami).

The celebration of Durga Puja brings unity across many people as they come together to celebrate this annual event. At this time of the year, we get to see all our friend and family members while also making new friends. A few of my friends are met during Durga Puja. We get to eat the prasad and pray to God on what we wish to come true in our coming future. It is a celebration of good overcoming the evil. These are the reasons why I think Durga Puja is important.

The Nine Forms of Mother Divine and her gifts to you

The nine nights of Navratri celebrate and honor the nine diffrent aspects of Mother Divine also known as Devi Durga. The first form is Shailaputri. This form gives you strength, courage and composure. The second form is Brahmacharini. Praying to this form gives you the recognition of your true nature i.e infinity. When we recognize our true nature, we become vast and powerful with a lot of vigor, valor and strength. The third form is Chondraghata. Praying to this form gives you alertness in everything around you. The fourth form is Kushmonda, this form of Mother gives you creativity. The fifth form is Skandamata. This form gives skills, innocence, courage and compassion. The sixth form is Kathyaini. She helps bring healthier relationships. Now the seventh form is Kaalaratri. She brings dynamism through deep rest. The eight form is Maha Gauri. This form brings you wisdom that is elixir of life. The ninth form is Siddhidhatri. Praying to this form of Mother brings you the gift of perfection and enlightenment.

By: Pradipta Saha
Grade 6, Age 11

DATE: 2018-09-24

BY: UTSOB SAHA
GRADE: 8

About Devi Durga!

Devi Durga is a very important and powerful god. She is the most popular incarnation of Devi and one of the main forms of the Godess Shakti in the Hindu pantheon. Durga's name in sanskrit means "a fort" or "a place that is diffucult to overrun. Sometimes Devi Durga is referred to as Durgatinashini. She is the wife of Shiva.

Devi Durga's Weaponry:

→ The conch shell: Symbolizes the Pranava or the mystic word "om".

→ The bow and arrows: It's represents energy. When Devi Durga demonstrates her control over kinetic and potential.

→ The thunderbolt: Just like a real bolt of lightning can destroy anything it stikes.

→ The Lotus: In Durga's hand, not yet fully in bloom, represents the certainty of sucess.

→ The Sudarshan-Chakra: This item spins around the index finger of the Godess.

→ The sword: This sword of Durga that sybolizes her Knowledge.

→ The Trident: This is the symbol of three qualities, Satwa (inactivities), Rajas (activity), and Tamas (nonactivity).

Anirvan Das
Grade-4

Importance of Vegetarianism

Vegetarianism is practiced by people who don't have meat nor eggs in their daily foods. There are lots of different types of people in this world. There are diffrent races, religions people with different traditions and more. There are people in this world who eat meat and people who don't. There are lots of benefits to eating a non-meat diet. One good thing of vegetarianism is that their diets usually have less fat and higher fibre which is good for us. Vegetable are also easy to digest and easy to chew which makes them great for little kids. Eating a no meat deit will get you to have a more balanced weight. This is why I think there is importance in vegetarianism.

STUDENTS OF DURGA PUJA

The Story of Shaligram Sheela

To the Vaishnava (devotees of Vishnu) Shaligram sheela is an aniconic representation of Lord Vishnu. Such anthropomorphic religious images (murtis) are commonly found in Hinduism, which are abstract symbols of God. Shaligram Sheela(s) are black in color and are ammonite fossils worshipped as manifestations of Vishnu Himself. A typical Sheela has a hole inside the round black stone, which is visible from outside. Inside the hole contains fossil remains as markings of past microbial lives, perhaps algae. These markings, believed to resemble Vishnu's paraphernalia, such as mace, conch, lotus and disc. The Sheela(s) are usually hereditary and are passed down through many generations, never being purchased or sold. Most Shaligram Sheela(s) are obtained from Gandaki River at Muktinath Chettra in Nepal, under the foothills of Himalayas (see map). Gandaki River is one of the five tributaries of the holy River Ganges. Others are Yamuna, Gomti, Ghaghara, and Teesta. The basin of Gandaki contains three of the world's 14 highest mountains over 8000 m (Dhalulagiri, Manaslu and Annapurna). According to Vaishnava belief, the worshipper of a Shaligram Sheela must adhere to strict rules, such as not touching the Shaligram without bathing, never placing the Shaligrama on the ground and not indulging bad practices. Shilagram deity and the tulsi plant are always worshipped together as Vishnu and Lakshmi. Shaligrams are also collected from the River Narmada, another holy river of India. They are called Narmadeshwar Shaligram. It, however, does not have the fossil mark of chakra and are of different colours.

How is Tulsi associated with Vishnu?

Tulsi is venerated as a goddess in Hinduism and sometimes considered as beloved of Lord Vishnu (Vishnuypriya). According to Hindu mythology (Padma Puran) Tulsi was a woman named Vrinda (or Brinda). She was married to the demon king Jalandhar. Due to Vrinda's piety and devotion to Vishnu, Jalandhar (her husband) became invincible. Even God Shiva, the destroyer in the Hindu trinity (Brahma – the creator, Vishnu – the preserver, and Shiva or Maheshwar – the destroyer) could not defeat Jalandhar. So Shiva requested Vishnu, to find a solution. Vishnu disguised himself as Jalandhar and violated Vrinda. Her chastity destroyed, Jalandhar was killed by Shiva. Vrinda cursed Vishnu to become black in colour and he would be separated from his wife. Thus, he was transformed into the black Shaligram stone and in his Rama Avatar, his wife Sita was kidnapped by a demon-king and thus separated from him. Vrinda then burnt herself on her husband's funeral pyre or immolated herself due to the shame. The gods or Vishnu transferred her soul to a plant, henceforth which was called as Tulsi. Apart from the mythology, tulsi is also a great medicinal plant used in Aurvedic medicine for cure of many diseases. In India, most devoted Hindus and especially the devotees of Vishnu keep a tulsi plant in the middle of their courtyard.

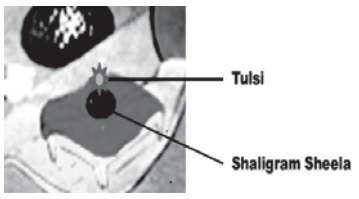

WORSHIP OF BASIC FIVE GODS

পঞ্চদেবতা

Panchadevata

All Hindu puja rituals involve the worship of other Gods and Goddesses before focusing on the principle deity. These Gods and Goddesses regulate our lives in many ways. These include the group of five gods or Panchadevata (পঞ্চদেবতা), the Guardians of the directions (*Dashadikpal*) and the nine planets (*Navagraha*) are revered and so also Vishnu's various incarnations (*Dashavatar*) which connect to our process of biological evolution. The group of five Gods (one is Goddess) are: Ganesh, Vishnu, Shiva, Surya and Jagadhatri (Parvati). They are worshipped in three steps – dhyan, offfering and pranam. You may not repeat the worship of those Gods whom you have already worshipped.

Ganesh

Shri Ganesh is the God of wisdom and worshipped at the beginning. He removes all obstrucles. He is always worshipped before any puja.

Meditation

ধ্যান

Dhyan

Take a flower on your left palm. Hold it with the mudra for meditation (kurma). Imagine Ganesh in your mental screen, chant the mantra and place the place the flower on the holy pitcher, imagining that you are putting the flower on His feet.

ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রসন্দন্মদগন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলং।
দন্তাঘাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দুর-শোভাকরং।
বন্দে শৈলসুতা-সুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং।
এস সচন্দনং পুষ্পাঞ্জলি নমঃ গণেশায় নমঃ ॥

Om kharba sthula tanum gajendrabadanam lambodaram sundaram |
Prasanna ananda gandhalubdha madhupa balyola gandastalam
Danta aghata bidari arirudhirai sindur shobhakaram
Vandey sGloryasuta sutam Ganapati siddhipradam kamadam |
Esha sachandana pushpanjali namah Ganeshaya namah ||

Oh the short structured, heavy-bodied, elephant-headed beautiful God,
with long trunk and happy face emitting fragrance,
who has strong cheek and whose task pierced open the enemy's body and
dripping blood, making it beautifully red.
May I worship him, the son of the mountain's daughter Parvati (daughter of Hemabat),
the leader of the people. May my wish be fulfilled.

Offerings

পূজা

Panchaupacarey puja

Offer water to wash the feet of the Lord on the offering plate:

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ নমঃ গণেশায় নমঃ।

Etey gandhapushpey Om namah Ganeshaya namah

I am offering my flower with eference to Lord Ganesha

Prostration

প্রণাম

Pranam

With folded hands seek His blessings:

একদন্ত মহাকায় লম্বোদর গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥

Ekadanta mahakayam lambodara gajananam
Vighnanashakaram debam herambam pranamamyaham ||

With one tusk, big in size, with long trunk, with elephant face,
Remove all the hurdles, Oh the heroic Lord, I bow to you.

Vishnu
বিষ্ণু

Meditation
ধ্যান
Dhyan

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমন্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ সরসিজাসনঃ সন্নিবিষ্ট কেয়ুরবান্।
কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী হিরন্ময় বপুর্ধৃতঃ শঙ্খচক্রঃ ॥

Om dhayah sada savitrimandal madhyabarti Narayana
Sarasijasanah sannibishta keyurban kanka kundalavan
Kiritihari Hiranmaya bapur dhritah shankhachakrah ||

I am meditating on Narayana the God
who is in the center of the solar system.
Seated on a lotus, wearing armlets and alligator-shaped earrings, whose body is golden and holding conch and disc (chakra) in His hands.

Offerings
পূজা
Puja

This is explained earlier. Use the following mantra for offering each of the five things.

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ নমঃ বিষ্ণবে নমঃ ॥

Etey gandhapushpey Om namah Vishnabey namah
I am offering my flower with obeisance to Lord Vishnu

Prostration
প্রণাম
Pranam

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ। জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

Om namah Brahmanya devaya go Brahmana-hitayacha |
Jagadhitaya Shri Krishnaya Govindaya namo namah ||

I bow to that Lord Almighty (Brahman)
the well wisher of learned (Brahman) and bestower (cow).
The keeper of the Universe,
Oh the Lord Krishna Oh the Govinda I prostrate to you repeatedly.

Shiva
শিব

Meditation
ধ্যান
Dhyan

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতি-হস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত-মমরগর্ণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং,
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥

Om dhyaayen-nityam Mahesham rajatagirinibham
Charuchandrabatamsam
Ratnakalpojvalagam parashu-mriga-bara-abheeti-
hastam prasannam |
Padmaasinam samantaat stutam-amaraganaih-

byaaghrakrittim basaanam
Viswadyam viswabeejam nikhila-bhayaharam
panchavaktram trinetram ||

Meditate constantly on the Mighty Lord Shiva,
whose body is as white as silver mountain,
who wears the beautiful crescent moon as a decoration,
whose limbs are effulgent adorned with gems,
who with his four hands holding axe and antelope and
showering boons and protections, who is always content,
who is seated on a lotus, and praised by the gods surrounding Him from,
who wears the skin of a tiger,
Who is the best in the Universe, which He created,
the destroyer of all fears, and vision with five faces and three eyes.

Offerings a flower and belpata, if available

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।

Etey gandhapushpey Om namah Shivaya namah

I make my offering of flower to Lord Shiva

Prostration
প্রণাম
Pranam

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর ॥

Namah shivaya shantaya karana traya hetabey |
Nibedayami chatmanam twam gati parameshwara ||

Obeisance to Lord Shiva! He is calm, the source of the three basic qualities (guna) of life – truth/knowledge (sattva), greed/passion (raja and, dark/ignorance (tama),
I am submitting to you Oh Lord, I am having no other choice.

Surya (Sun)
সূর্য্য

Meditation
ধ্যান
Dhyan

ওঁ রক্তাম্বুজাসন মশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্ম্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥

Om raktaambujaasanam asheSa-gunaika-sindhum
Bhaanum samasta-jagataam-adhipam bhajaami |
Padma-dwaya-abhayabaraan dadhatam karaabjaih
Maanikyamalim-aruNaama-ruchin trinetram ||

Sitting on red lotus with ocean of unlimited qualities, Oh the illuminating Sun God,you are the lord of the whole world.
With one hand you are holding lotus and with another,
offering boons of fearlessness.
Your physical appearance is radiant like ruby and you have three eyes. I worship you.

Offering
পূজা
Puja

Offer a flower dipped in red sandalwood:

এতে গন্ধ পুষ্পে নমঃ সূর্য্যায় নমঃ।

Etey gandha pushpey namah Suryaya namah |

Glory to the Sun God Surya

Then offer a little rice on the holy pitcher or on the offering plate:

ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রংশো তেজরাশে জগৎপতে
অনুকম্পায় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরম্।
এষ অর্ঘ্যং নমঃ সূর্য্যায় নমঃ ॥

Om! Ehi Surya sahasrangsho tejarashey jagatpatey |
Anukampaya mam bhaktam grihanargham divakaram ||
Esha argham namah Suryaya namah||

Oh Sun, whose millions of rays enlightens this earth
Accept the offering from this humble devotee of yours
Oh the day maker, Oh the Sun, here is my offering to you with humility.

Prostration

প্রণাম

Pranam

Pray with folded hands, imagining the rising sun in front of you:

ওঁ জবা কুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতো হস্মি দিবাকরং ॥

Om jaba kushma sankasham kashyapeyam mahadyutim |
Dhyantarim sarbapapagna pranatoshmi divakaram ||

Like the jaba flower (red colored Shoe flower), the son of Kashyap,
with brilliant illumination, destroyer of darkness, remover of all sins (ignorance), I bow to you the day-maker.

Durga

দুর্গা

Meditation

ধ্যান

Dhyan

ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ-রিকুল-ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং,
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈ-রুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহ-স্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবন-মখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং,
ধ্যায়েদ্ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশ পরিবৃতাম্ সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥

Om Kala-abhrabham katakshair-arikula-bhayadaam
mauli-baddheyndurekham shankham chakram kripanam
trishikhamapi karaih-rudwahantim trinetraam |
Sinhaskandha-adhiruddham
Tribhuban-makhilam tejasa purayantim
dhyaayed Durgam Jayakhyam tridasha-paribritam
sebitam siddhikamaih ||

One should meditate on Mother Durga whose another name is Jaya,
who has the complexion of deep dark cloud,
whose mere glance can arouse fears to the enemies,
tightly fastened in her crown is the shining crescent moon.
Who has three eyes, who is holding conch, disc, sword, and
three-pointed weapon (trident) in her hands,
Who is riding on a lion, and is energizing all
three worlds with her brilliant light, who is always surrounded by gods,
she is served by those who want success.

Offerings

পূজা

Puja

এতে গন্ধ পুষ্পে হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ॥

Etey gandhapushpey Hring Om Durgawai namah ||

In the spirit of divinity (Hring, the primordial sound for Durga)
I am offering this scented flower to you Oh Goddess Durga.

Prostration

প্রণাম

Pranam

ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে ॥

Om sarvamangala mangalye Shivey sarbartha sadhikey |
Smaraney trambhakey Gouri Narayani Namastutey ||

Oh the wife of Shiva, you are the benevolent peace giver of us, fulfiller of our wishes,
I am seeking your protection Oh the three-eyed fair Goddess of wealth (Narayani).
I offer my obeisance to you.

ESTABLISHING THE HOLY PITCHER

কলশস্থাপন

Kalasha Sthapan

The Holy Pitcher and Five Great Elements of Life

The pancha mahabhuta, or "five great elements" are: Tej (energy), Ap (water), kshiti (earth), Marut (air), Vyom (cosmos). Hindus believe that all of creation, including the human body, is made up of these five essential elements and that upon death, the human body dissolves into these five elements of nature, thereby balancing the cycle of nature. Life depends on these five great elements and in the same way that we rely on God and His blessing.

The Kalash (কলশ, holy pitcher) represents all the aforesaid five elements where the leaves are the captured energy from the sun, water is filled inside the pitcher, and earth is kept under the pitcher. The air and cosmos naturally surround the pitcher. The following hymn exemplifies the Hindu concept of creation. It is chanted as the holy pitcher is established.

Hiranyagarbha (হিরণ্যগর্ভ) literally means the 'golden womb' or 'golden egg', poetically rendered 'universal germ'. It is the source of the creation of the Universe or the manifested cosmos in Indian philosophy. It is mentioned in Rigveda (RV 10) and known as the **'Hiranyagarbha sukta'**. It declares that God manifested Himself in the beginning as the Creator of the Universe, encompassing all things, including everything within Himself, the collective totality, as it were, of the whole of creation, animating it as the Supreme Intelligence.

WORSHIP OF NINE PLANETS

নবগ্রহ পূজা

Nabagraha worship

Naba is nine and graha is cosmic influencer of the living being on this earth (Bhumidevi). These include five planets – Mamala (Mars), Budha (Mercury), Brahaspati (Jupitor), Sukra (Venus), Sani (Saturn); Sun (Aditya, Rabi), Moon (som), as well as Moon's orbital positions in the sky – Rahu (north or ascending lunar node) and Ketu (south or descending lunar node).

Note: Lunar nodes are the orbital nodes of the moon, that is, the points where the orbit of the moon crosses the ecliptic. The ascending node is where the moon crosses to the north of the ecliptic. The descending node is where it crosses to the south. Eclipses occur only near the lunar nodes. The mantra "Adityadi (Aditya or sun and others) Navagraheybhyo namah" takes care of all the nine planets. Worship of individual members of Nabagraha is done during Havan, described later.

Make five offerings in the name of the nine planets:

এষ গন্ধঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।

Esha Gandhah Om Adityadi Nabagraheybhyo namah

Here I offer sandalwood, flower, incense name and food platter to Aditya and other nine planets

এতৎ পুষ্পং ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।
Etat pushpam Om Adityadi Nabagraheybhyo namah

এষ ধূপঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নঃ।
Esha dhup Om Adityadi Nabagraheybhyo namah

এষ দীপঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।
Esha dwipah Om Adityadi Nabagraheybhyo namah

এতদ্ নৈবেদ্যং ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।
Etat naivedyam Om Adityadi Nabagraheybhyo namah

(Note: separate naivedya with five mounds of rice and a small fruit on each mound makes the nabagraha-naivedya).

New Age Purohit Darpan, Book-3, Durga Puja, By Dr. Kani L. Mukherjee, Dr. Bibhas Bandyopadhyay, and Dr. Aloka Chakrabarty, USA

বাউল

স্বামী পরমানন্দ

'বাউল' শব্দটি 'বাতুল' শব্দের অপভ্রংশ। 'বাতুল' শব্দ ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে 'বাউল' শব্দে পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে। 'বাউল' শব্দের প্রকৃত মর্মার্থ হল–বাহ্যজ্ঞান রহিত উন্মাদ। অর্থাৎ যিনি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের চেতনাশূন্য, বিষয়বুদ্ধি রহিত ভগবৎ প্রেমে পাগল। আর এই ভাবমুখী প্রেমোন্মাদ মানুষকেই 'বাউল' বলা হয়।

বাউলগণ নিজেদের 'সহজিয়া বৈষ্ণব' নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। বাউলগণ কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ স্বীকার করেন না। সহজিয়া বাউলগণ নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক সহজ পথের পথিক নামে আখ্যাত করেন এবং তাদের সাধনাকে রসসাধনা ও নিজেদেরকে রসিক নামেও পরিচয় প্রদান করে থাকেন।

বৈদিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত যে সমস্ত বৈষ্ণব মতবাদগুলি প্রচলিত আছে–যথাক্রমে গৌড়ীয়, বল্লভ, নিম্বার্ক, শ্রী এবং মধ্ব–এই মতবাদগুলির সঙ্গে সহজিয়া বাউলদের মতের পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সহজিয়া বাউলগণ বলে থাকেন–যা বৈদিক সম্প্রদায়ের অনুগত সাধনা তা হল সাম্প্রদায়িক সাধনা। রসিকগণ বলেন বেদাদি শাস্ত্রে কেবল রসতত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা: 'রসো বৈ সঃ।/ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।/ কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ/ যদেশ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ/ এষ হ্যেবানন্দয়াতি।'

বাউলগণ নিজেদের 'সহজিয়া বৈষ্ণব' নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। বাউলগণ কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ স্বীকার করেন না। সহজিয়া বাউলগণ নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক সহজ পথের পথিক নামে আখ্যাত করেন।

কিন্তু রসতত্ত্বের সাধনা বেদে স্পষ্টত উল্লিখিত বা নির্দিষ্ট নেই। এই রসতত্ত্ব হল অতি গুহ্য বিষয়। কেবলমাত্র ভগবৎ কৃপা এবং গুরুকৃপাবলে এটা অবগত হওয়া যায়। এই রস-সাধনার নামান্তর বাউলদের সহজ সাধনা।

সহজিয়া বাউলগণ বলেন–এই সাধনা সাধারণ মানবের পক্ষে উপযোগী নয়। সদগুরুর পরামর্শে এবং তাঁর নির্দেশিত পথে যোগের অভ্যাস দ্বারা পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়জয় সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রস-সাধনার অধিকার লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয়বিজয়ী রসিকগণেরই কেবলমাত্র রস-সাধনায় অধিকার জন্মে।

বৈদিক শাস্ত্রাদিতে রসতত্ত্বের বা সহজিয়া তত্ত্বের সাধনার কোন স্পষ্টত উল্লেখ না থাকায় সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবমতগুলিতে এই রসতত্ত্ব বা সহজ সাধনা প্রচলিত নেই। আর যদিও থাকে তাহলে তা প্রকাশ্যভাবে নেই গুপ্তভাবে থাকলেও থাকতে পারে। সেই হেতু সহজিয়া বাউলগণ নিজেদের অসাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করেন।

এই সহজিয়া বাউলগণ ভক্তি প্রেমতত্ত্বকে যতটা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, অন্যত্র প্রেমভক্তির ঠিক ততটা বিশ্লেষণ দেখতে পাওয়া যায় না।

সহজিয়া বাউলদের উৎপত্তি বিষয়ে নানাজনের নানারকম মতবাদ প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন বৌদ্ধ, বজ্রযান, সহজযান এবং হিন্দুতন্ত্রের সংমিশ্রণ-ধারা হতে এঁদের উৎপত্তি। কিন্তু বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান এবং তন্দ্রের ধারা সংমিশ্রিত হয়ে কিভাবে তা সহজ সিদ্ধান্তরূপে আবির্ভূত হল– তা ঐতিহাসিক আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ বিষয়। সুতরাং এখানে সেই বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বা নিরর্থক। তবুও এটা নিশ্চিত যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালের পূর্বেও সহজিয়া সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল এবং তা যথেষ্ট প্রমাণসিদ্ধ। যেমন– উল্লেখযোগ্যরূপে জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি সহজিয়া বৈষ্ণবগণ বিদ্যমান ছিলেন। তাহলেও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়– শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্তীকাল হতে এই মতবাদের পূর্ণ বিকাশও সম্ভব হয়েছিল।

সহজিয়া বাউলদের ভিতর এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে–শ্রীমন্মহাপ্রভু-পার্ষদ স্বরূপ দামোদর গোস্বামী হলেন এই মতের আদিগুরু। তাঁর নিকট হতে শ্রীরূপ গোস্বামী রসতত্ত্ব এবং সহজ সাধনার রহস্য অবগত হয়েছিলেন। তাঁর পর যথাক্রমে শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং সিদ্ধ মুকুন্দদেব গোস্বামী এই রসতত্ত্ব ও সহজ সাধনার রহস্য জ্ঞাত হয়েছিলেন। এই মুকুন্দদেব গোস্বামী রাজপুত্র ছিলেন। তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীর আশ্রয় পেয়েছিলেন। এইরূপ কথা বাউলদের ভিতর প্রচলিত আছে যে– শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁকে দিয়েই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়েছিলেন। আবার এইরূপ কিংবদন্তীও আছে যে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলে যেতেন আর শ্রীমুকুন্দদেব গোস্বামী তা লিখতেন। ❑

'বাউলের মর্মকথা' থেকে সংকলিত।

গায়ক ভক্ত কবি রজনীকান্ত সেন

প্রণব কুমার মিত্র

যশের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। খাতায় নিয়ম করে লিখে যাননি একটিও গান। স্বদেশি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া, ক্যান্সার... তাও তিনি সরল, সহজ কান্তকবি। রজনীকান্ত সেন। ২৬ জুলাই ১৮৬৫, তাঁর ১৫৩ তম জন্মবার্ষিকী।

"সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হরি,
সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে!
(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি,
অমনি সুখ দিয়ে দাও শিক্ষে।
মত্ত হয়ে সদা পুত্র-পরিবারে,
ধন, রত্ন, মণি-মাণিক্যে
আমি ধুয়ে মুছে ফেলি তোমার নামগন্ধ,
মজে তার চাকচিক্যে।"

তাৎক্ষণিক স্বভাব কবি, সুরকার, গায়ক ভক্ত রজনীকান্ত পরম দয়াময় ঈশ্বরকে নিজের দোষের ও অক্ষমতার কথা স্বীকার করেছেন এই কবিতায়।

রজনীকান্ত সেন বা কান্তকবি ২৬ জুলাই ১৮৬৫ (১২ শ্রাবণ, ১২৭২ বঙ্গাব্দ) বুধবার, ভোরে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামের বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ও মাতা মনোমোহিনী দেবীর তৃতীয় সন্তান। রজনীকান্ত ভাঙ্গাবাড়িতে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন পিতা গুরুপ্রসাদ সেন কাটোয়ার মুন্সেফ। পরে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কালনায় বদলি হয়ে যান। আর ওঁর জ্যাঠামশাই গোবিন্দনাথ রাজশাহির নামজাদা উকিল। বাল্যবয়স থেকে তিনি সুঠাম দেহের লাবণ্যে ভরপুর। ছেলেবেলায় পড়াশোনায় এতটুকু মন ছিল না। তার বদলে ঘুড়ি ওড়ানো, মাছ ধরা, পাড়া-প্রতিবেশীদের গাছ থেকে ফল-ফুল চুরি করা আর পাখির বাসা থেকে বাচ্চা পাখি নামিয়ে তার সঙ্গে খেলা করেই দিন কাটাতে ভালো লাগত। তাই গ্রাম্য বিদ্যালয়ে তাঁর আর পড়াশোনা হয়নি। সরাসরি রাজশাহিতে বোয়ালিয়া বিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শুরু। জ্যাঠতুতো দুই দাদা বরোদা গোবিন্দ সেন এবং কালীকুমার সেন... রাজশাহিতে দু'জনেই ওকালতি করতেন। কালীকুমার রজনীকান্তকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এই কালীকুমার খুব দুরন্ত ভাইটিকে শান্ত করবার জন্য বাংলায় নানা উপদেশ ভরা ছোট ছোট কবিতা লিখে তাতে সুর ও ছন্দের মোড়কে সিক্ত করে তাই পড়তে দিতেন। এই থেকে কালীকুমার দাদার মতো কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা পান ও তাতে সুর দেওয়ার একটা নেশা লেগে যায় বালক রজনীকান্তর। এমনি করে কালীকুমার দাদার উৎসাহে ও প্রত্যক্ষ তালিমে রজনীকান্তও কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাই কালীকুমারকেই রজনীকান্তের কাব্যগুরু বলা যায়। ছেলেবেলা থেকে কোনও মধুর গান শুনলেই তন্ময় হয়ে আত্মহারা হয়ে যেতেন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এমনকী ভিখারির গান শুনেও নিজে তা তুলে নিয়ে সকলকে শুনিয়ে মোহিত করে দিতেন। শোনা গান গাওয়ার সময় কোনও কথা ভুলে গেলে নিজেই তার বদলে তখনই শব্দ যোগ করে গেয়ে যেতেন। একটা বাঁশি নিয়ে বারবার বাজাতেন গানের সুরগুলি। রাজশাহিতে প্রতিদিন ব্যায়াম অভ্যাস করে প্রদর্শনীতে পুরস্কার পান। তাছাড়া কাবাডি, ফুটবল আর পদ্মানদীতে সাঁতার কাটা রোজকার অভ্যাস ছিল। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ইংরেজি থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করার যে প্রশ্ন আসত, চতুর্থ শ্রেণি থেকেই তা পদ্যে লিখতেন রজনীকান্ত। ছুটির সময় দেশের বাড়ি ভাঙ্গাবাড়িতে যেতেন। সেই সময় তারকেশ্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে ভীষণ বন্ধুত্ব হয়, যা শেষজীবন পর্যন্ত ছিল। পাবনা ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র লাহিড়ী রাজশাহিতে আসেন শিক্ষার্থী হিসেবে। সেই সময়ে গুরুপ্রসাদ সেন শ্রীযুক্ত লাহিড়ীকে নিজের বাড়িতে রেখে রজনীকান্তের পড়াশোনার ভার দেন। গোপালচন্দ্র লাহিড়ীর চেষ্টায় ওই দুরন্ত ছেলে শান্ত হয়ে যায় এবং পড়াশোনায় গভীরভাবে মন দেয়। এন্ট্রান্স পরীক্ষার কিছুদিন আগে রজনীকান্ত আপন খেয়ালে 'সতীর দেহত্যাগ' ঘটনাটি সংস্কৃত কবিতায় লিখেছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে রজনীকান্ত আগমনী ও বিজয়ার উপর গান রচনা ও সুর দিয়ে বাড়ির দুর্গা দালানে বিভোর হয়ে গেয়ে সকলকে অবাক করে দেন। আর এক বাল্যবন্ধু গোপালচরণ সরকার, তিনিও কবি। পাড়ার সকলের উপস্থিতিতে প্রায়ই দু'জনের কবিতার লড়াই হতো। আঠারো বছর বয়সে রজনীকান্ত দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করে ১০ টাকা বৃত্তি ও রাজশাহি জেলায় ইংরেজিতে প্রবন্ধ রচনার কৃতিত্বের জন্য 'প্রমথনাথ বৃত্তি' মাসিক ৫ টাকা পান।

> রজনীকান্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপে প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন। হঠাৎই শুনলেন রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কলকাতার এক সভায় গান গাইবেন। শুনেই রাজশাহি থেকে কলকাতায় এসে অ্যালবার্ট হলে বিরাট সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে।

রাজশাহি কলেজে পড়ার সময় বাবা-মা'র ইচ্ছানুযায়ী রজনীকান্ত বিয়ে করেন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার বেউথা গ্রামের ডেপুটি ইন্সপেক্টর তারকনাথ সেনের তৃতীয় কন্যা হিরন্ময়ী দেবীকে। হিরন্ময়ী দেবী উচ্চ প্রাইমারি পাশ এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত। তাঁরও কবিতার প্রতি ভালোবাসা ছিল। রজনীকান্ত কবিতা ও গান রচনা করে কখনও কখনও স্ত্রীকে শোনাতেন, আবার তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধনও করতেন। ভাঙ্গাবাড়িতে ছুটিতে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের সকলকে নিয়ে নতুন রাস্তাঘাট, নর্দমা নিজেদের হাতে

করতেন। এইসব কাজের মধ্যে দিয়ে দেশ সেবার বীজ গ্রামবাসীর মধ্যে জাগিয়ে তুলতেন তিনি। ছুটিতে ছেলেবেলার বন্ধু তারকেশ্বর চক্রবর্তী ও রজনীকান্ত বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখে সকলকে অবাক করে দিতেন। সকলেই অবাক হতো তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতায়। যখন রজনীকান্ত থাকতেন না তখন তারকেশ্বর বিভিন্ন যাত্রা, পালাগান বা সঙ্গীত আসরে যা কিছু শুনতেন তা নিজে ভালোভাবে রপ্ত করে রাখতেন। আর রজনীকান্ত গ্রামে এলেই তা তাঁকে শিখিয়ে দিতেন। রজনীকান্ত স্বীয় প্রতিভাবলে সে সকল শিখে নিয়ে সকলকে শোনাতেন। তাল, লয়, সুর তারকেশ্বর নিজে শিখে রপ্ত করে রজনীকান্তকে শেখাতেন। আর শ্রুতিধর ছাত্র তা সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে শুনিয়ে দিতেন। তাই তারকেশ্বর চক্রবর্তীকে রজনীকান্তের সঙ্গীতগুরু বলা চলে। রাজশাহি কলেজে পড়ার সময়ে কখনও কোনও অধ্যাপক হয়তো ঠিক সময়ে ক্লাসে না এলে তাঁকে নিয়ে নানা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করে বন্ধুদের হাসাতেন। ১৮৮৫ সালে রাজশাহি কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফএ পাশ করেন। পাশ করার পর রজনীকান্ত পুজোর ছুটিতে ভাঙ্গাবাড়ি এলেন। আসার কয়েকদিন পরেই প্রচণ্ড জ্বর ও পেটের রোগে প্রায় যায় যায় অবস্থা জ্যাঠামশাই গোবিন্দনাথের। ভাঙ্গাবাড়ির বন্ধুরা রজনীকান্তের পাশে থেকে সেবা-শুশ্রূষা করে ভালো করে তোলার পরই বাবা গুরুপ্রসাদও জ্বর এবং পেটের রোগে অসুস্থ হয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই পরলোকগমন করেন। তখন ১৮৮৬ সাল। ছোট ভাইয়ের মৃত্যুশোক সদ্য সুস্থ হওয়া গোবিন্দনাথ সহ্য করতে পারলেন না। কয়েকদিনের মধ্যে তিনিও প্রাণত্যাগ করলেন। রজনীকান্ত তখন কলকাতার সিটি কলেজে বিএ পড়ছেন। সংসার এবং রজনীকান্তর কলেজের পড়ার খরচ–সবটাই জ্যাঠতুতো দাদা অর্থাৎ গোবিন্দনাথের ছোট ছেলে উমাশঙ্কর নিজে দিতেন। বিএ পরীক্ষার কয়েকদিন আগে রজনীকান্ত প্রচণ্ড অসুস্থ হন। ফলে একবারে বিএ পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেন না। পরে ১৮৮৯ সালে সিটি কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। পরে ওকালতিতে ভর্তি হয়ে ১৮৯১ সালে বিএল ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ করেন ও রাজশাহি আদালতে ওকালতি শুরু করেন। রাজশাহিতে তাঁর জ্যাঠামশাই সর্বপ্রধান উকিল ছিলেন, আর জ্যাঠতুতো দাদারাও বেশ ভালো আইনজীবী। তাই পারিবারিক সূত্রের জমিতে রজনীকান্ত খুবই অল্প আয়াসে ওকালতিতে পশার জমিয়ে তুললেন। ওকালতিতে যা উপার্জন করতেন, তার অনেকটাই রজনীকান্ত প্রতিবেশী ও পরিচিত দুঃস্থদের জন্য খরচ করতেন। সেটাই ছিল তাঁর আনন্দ।

রজনীকান্ত অভিনয় করতে খুব ভালোবাসতেন সেই ছোটবেলা থেকেই। রাজশাহি থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রাণী' নাটকটিতে রাজার চরিত্রে অভিনয় করে খুব সুনাম লাভ করেন তিনি। রজনীকান্ত রাজশাহিতে একটা ভাড়াবাড়িতে তখন থাকতেন। ইচ্ছে ছিল নিজস্ব বাড়ি করার। সে স্বপ্ন পূরণ করতে নেমেও পড়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ই জ্যাঠতুতো দাদা উমাশঙ্কর ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলেন। রজনীকান্ত আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দাদাকে বাঁচাতে পারলেন না।

রজনীকান্ত যে কোনও অনুষ্ঠানে তাৎক্ষণিক গান রচনা করে তাতে সুর দিয়ে নিজেই গাইতেন। রাজশাহিতে ওকালতি করার সময় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে রজনীকান্তের পরিচয় হয়। রাজশাহিবাসীরা কবির সম্মানে এক সংবর্ধনার আয়োজন করেন এবং সকলের অনুরোধে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আমরা ও তোমরা' নামে হাসির কবিতাটি গান করে শোনান। সেখানে রজনীকান্ত উপস্থিত ছিলেন। দু'বছর পর রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আমরা ও তোমরা' এই হাসির কবিতার জবাবি কবিতা 'তোমরা আমরা' লিখেন, যা 'উৎসাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হল। সাধক রামপ্রসাদ যেমন জমিদারের সেরেস্তার হিসেবের খাতায় শ্যামা মাকে উদ্দেশ্য করে নানা গান হঠাৎ হঠাৎ লিখে ফেলতেন, ঠিক সেইরকম রজনীকান্তও ওকালতির সঙ্গে যুক্ত কাগজপত্রেই হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া অনেক গান ও কবিতা লিখে রাখতেন। এর জন্য অনেক সময় তাঁর নানা বিড়ম্বনাও হয়েছে।

হঠাৎই রজনীকান্তের তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেল। মৃত সন্তানের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন কান্তকবি। শূন্যদৃষ্টি। হঠাৎই গুনগুন করে উঠলেন কাঙাল হরিনাথের গান। সেই ছিল যে তাঁর মুক্তির উপায়, পাহাড়প্রমাণ শোক জয় করার ওষধি। করলেনও যে তাই! নিজেই জয় করলেন এই নিদারুণ শোককে। পরদিনই রচনা করে ফেললেন একটি গান। পুত্র শোকাতুর পিতাকে যাঁরা সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন, তাঁদের সামনেই সদ্য রচিত গানটি গেয়ে উঠলেন তিনি–

"তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দেওয়া বুকে, তেমারি অনুভব।
তোমারি দুনয়নে, তোমারি শোক বারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হাহারব!
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া।..."

সেদিন যাঁরা আসছেন, তাঁদের সবাইকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে রজনীকান্ত গান গেয়ে গেয়ে শোক উত্তীর্ণ হলেন। কান্তকবি কোনও দিনই কবি যশঃপ্রার্থী ছিলেন না। গান বা কবিতাও একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করে যাননি। ওঁর কবিতা ও গানগুলির কিছু বন্ধুবর অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় ছাপার ব্যবস্থা করেন ১৯০২ সালে "বাণী" কাব্যগ্রন্থ নামে, যা রজনীকান্ত আগে জানতেন না। "বাণী" তাঁর ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত বই। জীবিতকালে কান্তকবির আর দুটি বই "কল্যাণী" (প্রকাশকাল ১৯০৫) এবং "অমৃত" (প্রকাশকাল ১৯১০)। রজনীকান্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপে প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন। হঠাৎই শুনলেন রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কলকাতার এক সভায় গান গাইবেন। শুনেই রাজশাহি থেকে কলকাতায় এসে অ্যালবার্ট হলে বিরাট সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে। তাঁদের গান পরিবেশনের পর রজনীকান্ত প্রাণ ঢেলে গান গাইলেন। যা শুনে দু'জনেই মোহিত।

এর কিছুদিন পর রজনীকান্ত স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রামের বাড়ি ভাঙ্গাবাড়িতে যান। সেখানে যাওয়ার পর প্রথমা কন্যা

শতদলবাসিনী এবং দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্র হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়। পিতামাতার সামনেই অল্প দিনের মধ্যে অত্যন্ত আদরের কন্যা শতদলবাসিনী মারা গেল। তখন আর রজনীকান্ত স্থির থাকতে পারলেন না। কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পরে 'যাঁর দান তিনিই নিয়ে নিলেন' বলে শান্ত হলেন। ধীরে ধীরে অর্থ সংগ্রহ করে শতদলের বিয়ের জন্য যে সমস্ত জিনিসপত্র কিনেছিলেন, রজনীকান্ত তার সমস্ত কিছু মরদেহের সঙ্গে দিয়ে দিলেন শ্মশানে গিয়ে। সে যাত্রায় জ্ঞানেন্দ্র অবশ্য সুস্থ হয়ে যায়।

জনগণ ভালোবেসে রজনীকান্ত'র নাম দেয় 'কান্তকবি'। ওঁর বহু গানই অপ্রকাশিত কেবল সংরক্ষণের অভাবে। ভাবের প্রাবল্যহেতু রজনীকান্তর প্রায় সব কবিতা ও গান লম্বায় বেশ বড়। কান্তকবির গানে মোটামুটি তিনটি ধারা দেখা যায়– ভক্তি, স্বদেশ ও হাস্যরস। প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায় কম। ভক্তিমূলক গানই তাঁর মূল কথা। ভক্তিভাবে তিনি দয়ালু ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। গানে গানে বারবার তিনি আত্মনিবেদন করেছেন পথের সন্ধানের জন্য। প্রচণ্ড ঈশ্বরভক্তি, ব্যাকুলতা তাঁকে পাওয়ার জন্য আর বিশ্বাস করে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে গিয়েছেন গানের মধ্য দিয়ে। তাই তিনি গাইতে পারেন মিশ্র খাম্বাজ রাগে–

'কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি কত আশা করে বসে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে।
আহা তাই যদি নাহি হবে গো,–
পাতকি-তারণ তরীতে, তাপিত
আতুরে তুলে, না রবে গো,...'

আবার ঈশ্বরকে তিনি বলতে পারেন বেহাগ রাগে

–"(আমি) অকৃতী অধম বলেও তো,
কিছু কম করে মোরে দাওনি!
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া,
কেড়েও তো কিছু নাওনি!..."

আবার আকুল হয়ে নিজের অক্ষমতার কথাও নিবেদন করেছেন গানের কলিতে পরমপুরুষকে–

–"আমি সকল কাজের পাই হে সময়
তোমারে ডাকিতে পাইনে,
আমি, চাহি দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন,
তব সঙ্গ সুখ চাইনে।
আমি, কতই যে করি বৃথা পর্য্যটন,
তোমার কাছে তো যাইনে।..."

আবার কখনও সেই দয়াময়ের কোলে আশ্রয়ের জন্য কাতরভাবে গেয়ে ওঠেন–

"কবে তৃষিত এ মরু, ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসালো নন্দনে,
কবে তাপিত এ চিত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা চন্দনে...
কবে ভবের সুখ-দুঃখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব-গো, শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।"

আবার হাস্যরসাত্মভাবে নিজের অন্তিমকালকে স্মরণ করে বাউল গানের সুরে গেয়ে যান–

–"যমের বাড়ি নাই কোনও পাঁজি,
তাই নাইকো দিন-বাছাবাছি,
সে তো মানে না রে বারবেলা, দিক্‌শূল,
গ্রহগুলো রাজ্য হতে তাড়িয়েছে বিলকুল,
অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, কিছু তো নয় গররাজী।
মাসদগ্ধা, কি ভরণী, পাপযোগ,–
সে কি দেখে, কতক্ষণ কার আছে শনির ভোগ?..."

ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমানের সুসংহত শক্তিকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রশাসনের সুবিধার অছিলায় বঙ্গদেশকে ভাগ করে। প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহি নিয়ে পূর্ববঙ্গ। এই বিভাজনের পরিকল্পনায় বাংলার মানুষদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা হল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। দিকে দিকে বিদেশি জিনিসপত্র বর্জনের ডাক উঠল। ধীরে ধীরে প্রকাশ পেল স্বদেশী আন্দোলন। কলকাতার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রজনীকান্তকেও উদ্বেলিত করেছিল। অক্ষয়কুমার সরকারের বহুবাজারের মেসে এসে উঠলেন কান্তকবি। মেসের সব ছেলেদের অনুরোধে স্বভাব কবি তক্ষুণি এক অনবদ্য গান রচনা করে মেসের ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে মিছিল করে দরাজ গলায় গান ধরলেন–

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই,
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই..."

৩০-৪০ জন ছেলে ওই গান গাইতে গাইতে শিয়ালদহ হয়ে সার্কুলার রোড ধরে চলেছে মিছিল করে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর ল্যাবরেটরি থেকে ওই ওজঃশক্তিতে ভরপুর গানের কথা শুনে রাস্তায় বেরিয়ে এসে রজনীকান্তকে বুকে টেনে নিলেন। সেই সময় সর্বত্র 'বন্দেমাতরম' গান নিষিদ্ধ হয়েছে। কান্তকবি তা সহ্য করতে না পেরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে গেয়ে উঠলেন–

–"মা বলে ভাই ডাকলে মাকে
ধরবে টিপে গলা
তবে কি ভাই বাংলা হতে উঠবে রে মা বলা?

মারলে কি আর মা ডাক ছাড়তে পারি?
হাজার মারো মা বলা ভাই কেমন করে ছাড়ি?...”

ব্যক্তিগত জীবনে রজনীকান্ত হাসি উল্লাসের জীবন্ত মানুষ ছিলেন। মামলা জিতে মক্কেলদের দেওয়া হাঁড়ি ভর্তি মিষ্টি দেখে তিনি আনন্দে গেয়ে ওঠেন–

“যদি কুমড়োর মত, চালে ধরে রত,
পানতোয়া শত শত,
আর সরষের মত, হত মিহিদানা
বুঁদিয়া বুটের মত...
... আর তরমুজ যদি রসগোল্লা হত
দেখে প্রাণ হত খুশি!...”

আবার বাড়ির গিন্নিকে নিয়ে রসরচনা করলেন–

“আমরা রাঁধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো,
আর তোমরা বসিয়া খাও;
আমরা দু'বেলা হেঁসেলে ঘামিয়া মরি গো,
আর খেয়ে-দেয়ে তোমরা নিদ্রা যাও!
আজ এ বিপদ, কাল ও বিপদ করি গো,
হাতের দু'খানা গহনা ও টাকা-কড়ি গো,
না দিলে পরম প্রমাদে, প্রেয়সি, পড়ি গো
বলি লয়ে চম্পট দাও গো...।”

তদানীন্তন ব্রাহ্মণদের নিয়ে বা নিজের পেশা ওকালতি নিয়েও অনেক কবিতা লিখেছেন, যা পড়লে সকলকে হাসতে হবেই। গায়ক কান্তকবির গান গাইবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ ও বিস্ময়কর। একাদিক্রমে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা গাইতে পারতেন। তাৎক্ষণিক গান রচনা করে সুর দিয়ে গাইতেন বলেই বোধ হয় তাঁর অধিকাংশ গানই আয়তনে বেশ বড়।

রজনীকান্ত পান খেতে খুব ভালোবাসতেন। বোন ক্ষীরোদবাসিনী রাজশাহির ভাল ছাঁচি পান ও উৎকৃষ্ট চিড়ে প্রতি সপ্তাহে লোক মারফত পাঠাতেন ভাইয়ের জন্য। একদিন পানের চুন বেশি হওয়ায় রজনীকান্তের মুখের ভিতর ঘা হয়ে যায়। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এলেন। সাহেব ডাক্তার ওকেনলি জানালেন, রোগটি দুরারোগ্য ক্যান্সার হয়েছে। কিন্তু তাঁর যে রক্তে গানের নেশা! তিনি কোনও বৈঠকি আড্ডায় ৭-৮ ঘণ্টা গান গাওয়া ছাড়তে পারলেন না। ক্রমশ রোগ এমন পর্যায় পৌঁছাল যে, গলায় ফুটো করে রবারের নল ঢুকিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হল। শেষ অবস্থায় কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হলেন। বেশ কিছুদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হল। চিকিৎসা খরচ চালানোর জন্য অতি সামান্য টাকায় রজনীকান্ত তাঁর সন্তানসম ‘বাণী’ এবং ‘কল্যাণী’ কাব্য দুটির গ্রন্থস্বত্ব মায় অবিক্রীত ২০০টি বই সমেত বিক্রি করে টাকার বটুয়াটি স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর হাতে দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন– “হরিশ্চন্দ্র বিক্রি করল শৈব্যা ও রুহিতাশ্বকে”। ক্রমেই ভাষণ পটুর নির্বাক জীবন শুরু। বহুলোক অর্থ সাহায্য পাঠালেন। দীঘাপতির রাজকুমার শরৎ কুমার মোটা টাকা পাঠালেন চিকিৎসা ও সংসার খরচের জন্য। রজনীকান্তের ‘অমৃত’ বইটি স্কুল-কলেজের ছেলেদের কাছে বিক্রি করে অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছিল। মিনার্ভা থিয়েটারের মনমোহন পাঁড়ের নেতৃত্বে ‘রাণাপ্রতাপ’ ও ‘ভাগীরথী’ নাটক দুটি অভিনয় করে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। রজনীকান্তকে দেখতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাকবি নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছিলেন। ৮০ বছরের বৃদ্ধা জননী মনোমোহিনী দেবী সকলের অজ্ঞাতে তারকেশ্বরে গেলেন হত্যে দিতে... পুত্রের আরোগ্য কামনায়। কিন্তু সকলেই কান্তকবির রোগের কাছে হার মানলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০ সালে সকলকে কাঁদিয়ে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে সকলের প্রিয় কান্তকবি রজনীকান্ত পরম দয়াময়ের কোলে স্থান নিলেন। তখন বেঁচে তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং চারপুত্র শচীন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, ক্ষিতি চন্দ্র নাথ, শৈলেন্দ্রনাথ আর তিন কন্যা শান্তিবালা, প্রীতিবালা ও তৃপ্তিবালা এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ গিরীন্দ্রমোহিনী আর গুণমুগ্ধ ভক্তদল। ❑

শারদীয়
মহা

শারদীয়
প্রণামী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে

তন্ত্রের দেবী কালী

দূর্বা বাগচী

দেবী কালী কালকে গ্রাস করেন বলেই তাঁর নাম কালী। সাধকেরা যুগে যুগে তাঁদের সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য মা কালীর উপাসনা করেছেন। কালীপূজা প্রধানত তন্ত্র বা তান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হয়। তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে প্রকৃতিশক্তি কালীই বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র দ্বারা পূজিতা হন।

কিন্তু কে এই মা কালী? শ্রীশ্রী চণ্ডী অনুসারে একদা দুই দুষ্ট অসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে মহামায়ার বন্দনায় রত হলে মা পার্বতী বা গৌরীর দেহ থেকে দেবী কৌশিকী আবির্ভূতা হন। দেবী কৌশিকী গৌরীর দেহ থেকে বার হওয়া মাত্রই দেবী কৃষ্ণবর্ণা হয়ে যান। তিনিই কালী নামে পরিচিত হন।

আবার শ্রীশ্রী চণ্ডীতে চণ্ড ও মুণ্ড বধ উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে চণ্ড ও মুণ্ড তাদের অসুর সেনা নিয়ে দেবী অম্বিকাকে আক্রমণ করলে দেবী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবীর মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হয়। সেই সময় দেবীর ভ্রুকুটিকুটিল ললাট থেকে ভয়ংকরী দেবী কালী আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

আবার চণ্ড ও মুণ্ড বধের পর দেবী কালী এই দুই অসুরের কাটা মুণ্ড দুটি নিয়ে মঙ্গলময়ী দেবী চণ্ডিকাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই দৃশ্য দেখে দেবী চণ্ডিকা দেবী কালীকে বলেছিলেন, 'যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডের মুণ্ডদয় নিয়ে আমার কাছে এসেছ, সেই জন্য সংসারে তোমার নাম হবে 'চামুণ্ডা'।' আবার পুরাণ মতে, হিমালয়-পত্নী মেনকাকে দেবী সতী বর দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। সতীর দেহত্যাগের পর মেনকার তপস্যায় সাড়া দিয়ে তিনি মেনকার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নীলোৎপলদল শ্যামা গায়ের রং দেখে মা মেনকা কন্যার নাম রেখেছিলেন কালী। আসলে দেবী কালী হলেন পরমাপ্রকৃতি শক্তি আদ্যাশক্তি মহামায়ারই একটি রূপ।

তন্ত্রসাধনা সিদ্ধিলাভের একটি পথ। তন্ত্রসাধনার বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয়। এটি একমাত্র কোনও সাধকই তাঁর গুরুর নির্দেশে কঠোর সাধনার দ্বারা করতে পারেন। তবে সাধনার বিভিন্ন পথের মধ্যে দেবী কালীর উপাসনাই ভববন্ধন মোচন তথা সাধনায় সিদ্ধিলাভের সবচেয়ে ভালো পথ বলা হয়। তন্ত্রসাধনা মূলত পঞ্চ 'ম'-এর ওপর নির্ভর করে হয়। এই পঞ্চ'ম' হল, যথাক্রমে মদ্য, মৎস্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রা। তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁর গুরুর নির্দেশিত পথে সিদ্ধিলাভের জন্য মা কালীর উপাসনা করে থাকেন। সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে সাধকের রিপু দমন হয়। তাঁর অহংবোধ, স্নেহ অন্যান্য ভেদাভেদজ্ঞান শেষ হয়ে গিয়ে তাঁর মধ্যে পূর্ণ আত্ম নিবেদন সৃষ্টি হয়। শিশুত্ববোধ জেগে ওঠে। তখনই তিনি মাতৃশক্তির স্বরূপ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। সাধকের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। তন্ত্রমতে কালী সাধনার বিষয়টি একটু জটিল। স্বল্প পরিসরে তা আলোচনা করা সম্ভব নয়। অনেক সময় বৈষ্ণব মতে তামার বাসনে ডাবের জলে আদার কুচি দিয়ে কারণবারি বলে মাকে উৎসর্গ করা হয়। মাকে নিরামিষ ভোগ দান করা হয়। সে যাই হোক না কেন মা কালীকে কোনো মন্ত্রদীক্ষিত ব্রাহ্মণ ব্যক্তি শুদ্ধাচারে মন্ত্রোচ্চারণ ও পুজো পদ্ধতির নানা দিক মেনে পুজো করেন। পণ্ডিতেরা বলেন যে, দেবী কোনো কিছুই খান না, তাঁর অনুচরেরা তা গ্রহণ করেন। কাজেই ভোগ নিরামিষ কী আমিষ, ভোগের পরিমাণ অল্প না বেশি এইসব মাতৃপূজায় তুচ্ছ। অন্তর থেকে ভক্তিভরে মাকে ডাকা। অন্তর থেকে ডাকলে মা কালী সাড়া দেন।

তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁর গুরুর নির্দেশিত পথে সিদ্ধিলাভের জন্য মা কালীর উপাসনা করে থাকেন। সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে সাধকের রিপু দমন হয়। তাঁর অহংবোধ, স্নেহ অন্যান্য ভেদাভেদজ্ঞান শেষ হয়ে গিয়ে তাঁর মধ্যে পূর্ণ আত্ম নিবেদন সৃষ্টি হয়। শিশুত্ববোধ জেগে ওঠে।

তন্ত্রে বা তন্ত্রমতে মা কালীর সাধনা হল মানুষের কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা। যোগশাস্ত্রে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি –এই তিনটি গ্রন্থি ভেদ করলেই সাধন পূর্ণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সংযম করে একের পর এক চক্রগুলিকে ভেদ করে একেবারে মস্তিষ্কে আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থিকে ভেদ করে তখন সাধক শিশুর মতো হয়ে যান, তখন তিনি ভেদাভেদ জ্ঞানশূন্য, এক তুরীয় আনন্দের আলোকে ভেসে যান। তখনই মায়ের দেখা পান সাধক। আসলে এই মাতৃসাধনা বড়ই কঠিন সাধনা। তাই তন্ত্রসাধনা বড় কঠিন। তন্ত্রমতে মা কালীর গাত্রবর্ণ, চার হাত, ত্রিনয়ন, জিহ্বা, দাঁত, কান, পা, মুণ্ডমালা, খড়্গ, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, হাতের ছিন্নমুণ্ড এমনকী মায়ের পদতলে শায়িত শিব সবকিছুর সঙ্গেই কিছু গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে। যার অর্থ ভালোভাবে বুঝতে পারলে মাতৃমূর্তিই সাধককে অনেক জ্ঞানদান করেন। অনেকে বলেন, তনু থেকে তন্ত্র কথাটা এসেছে। তাই তন্ত্রসাধকেরা দেহতত্ত্বের কথা মাথায় রেখে মদ্য, মৎস্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রা– এই পঞ্চ'ম' দ্বারা মাতৃসাধনা করে থাকেন। তবে সিদ্ধিলাভ হয়ে গেলে তখন সাধকের আর কোনও মোহবন্ধন থাকে না। অন্তর ও বাইরের শুচিতা ও সঠিক পথে মা কালীর সাধনা করতে পারলে তবেই মানুষ ঈশ্বরপ্রাপ্তি লাভ করেন।

সবশেষে বলব সাধনা বিশেষ করে মাতৃসাধনার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। কঠোর সাধনা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। তাই কর্মময় জগতে কর্মের মধ্য দিয়ে ভালো কাজ ও মায়ের চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করে মা কালীর পুজো করলে সেটাই হবে মানুষের সঠিক মাতৃ সাধনা। সার্থক হবে কালীপুজো। ❑

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই

আবীর মুখোপাধ্যায়

আমৃত্যু সয়েছেন প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা। লাঞ্ছনা, অপমানও। থিয়েটারই ছিল তাঁর জিয়নকাঠি। তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

লোকটা আজ বেহেড মাতাল! শহরের বারাঙ্গনারাও তাঁকে দরজা খুলে দিতে নারাজ! কত গিলেছে কে জানে! মদ খেয়ে একেবারে টং! লাল চোখ। ওই দক্ষিণেশ্বরের কথা মনে পড়ল বুঝি। সে জানে সেখানে একজন আছেন, তিনি কখনও দরজা বন্ধ করেন না! যেমন ভাবা, অমনি জুড়ি গাড়িতে লাফিয়ে উঠল সে। নিজের লেখা পাহাড়ি পিলুতে খেমটা গাইতে গাইতে চলল। গঙ্গাপারের ভিজে হাওয়ায় ওই শোনা যাচ্ছে, 'ছি ছি ছি ভালবেসে/ আপন বশে কি রয়েছো।'

ঢের রাত। মন্দিরের চারপাশে নিকষ অন্ধকার। গাড়ি থামতেই, খোঁয়ারি জড়ানো গলায় লোকটা চিৎকার করল, "ঠাকুর, ঠাকুর!" বেরিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব! তিনি বুঝি অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, "কাতর প্রাণে, এমন করে কে ডাকে? গিরিশ না!" ঠাকুরের ছোঁয়ায় যেন বিদ্যুৎস্পর্শ। সংবিৎ ফিরে লজ্জায় নুয়ে পড়ল লোকটা।

পরমহংস বললেন, "মদ খেয়েছিস তো কি, আমিও মদ খেয়েছি। 'সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে, মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে'।" গান গাইতে গাইতে লোকটার হাত ধরে নাচতে লাগলেন ঠাকুর।

মোদো-মাতাল লোকটাই বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য ইতিহাসে তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ নট! গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

> 'ক্লাসিক'-এ থাকতেই একদিন চললেন তারকেশ্বরে মেয়ের জন্য পুজো দিতে। কলকাতায় যখন ফিরলেন, ততক্ষণে সব শেষ! শুনলেন দাহ হয়ে গিয়েছে মেয়ের দেহ! দুমড়ে উঠল বুক। কান্না হাহাকার হয়ে ভিজিয়ে দিল দু'চোখ!

গিরিশের জন্ম বাগবাজারে। বাবা নীলকমল ঘোষ ছিলেন সওদাগরি অফিসের বুক-কিপার। মা রাইমণি। পাঠশালায় একদিন হাফ-আখড়াইয়ের আসরে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবর্ধনা দেখে, গিরিশের ইচ্ছে হল কবি হওয়ার। কিন্তু লেখা-পড়ায় মন কই ছেলের! সারা দিন টো টো। মাকে হারিয়ে ফেলল গিরিশ।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবা নীলকমলবাবু গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণে বের হলেন। হঠাৎ ঝড়। নৌকা ডুবে যায়-যায়! গিরিশ শক্ত করে বাবার হাতটা ধরল। মা নেই, কার হাতই বা ধরবে! ঝড় থামলে নীলকমল বললেন, "হাতটা ধরে ছিলিস, নিজের প্রাণ বড় না তোর? নৌকো ডুবলে কি ভাবছিস, তোকে বাঁচাবার চেষ্টা করতুম? যেমন করে পারি নিজেকেই বাঁচাতুম।" এ কী শুনল গিরিশ! সে বুঝল এ পৃথিবীতে বিপদে তার হাত ধরার কেউ নেই আর। 'মা' বলে কেঁদে ফেলল সে। সারাজীবন এ ব্যথার উপশম মেলেনি তাঁর। দুঃখ ছিল নিত্য সহচর। যখন বয়স আট, এক দাদার মৃত্যু হল। চোদ্দো বছর বয়সে হারাল বাবাকে। বোনেদের মৃত্যুও দেখতে হয়। বাবা মারা যাওয়ার পরে বিয়ে হয়ে গেল গিরিশের। বউ, শ্যামপুকুরের নবীন সরকারের মেয়ে, প্রমোদিনী। বিয়ের পরে, গিরিশ ফের স্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু পরীক্ষাই দিলেন না। চুকে গেল তার স্কুলের সম্পর্ক। তাঁর উচ্ছৃখল জীবনযাপনে ভয় পেয়ে গেলেন শ্বশুরমশাই নবীনচন্দ্র। তিনি জামাইকে 'অ্যাটকিনশন টিলটন' কোম্পানিতে শিক্ষানবিশি চাকরি জুটিয়ে দিলেন।

গিরিশ হলেন 'বুক-কিপার'। এবার তার মতি ইংরেজি সাহিত্যে। কিন্তু স্বস্তির জীবন যে নয় তাঁর। অফিস গেল উঠে। ১৮৭৪, ডিসেম্বরে মারা গেলেন স্ত্রী। রেখে গেলেন ছেলেমেয়ের পালনভার। গিরিশের সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। দিন কাটে তখন গঙ্গার ধারে। নেশার দিন, কবিতার দিন।

বাগবাজার, কলুটোলা কখনও ১৪৫ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটেও। মৃত্যুর এই শমন একে একে কেড়ে নিয়েছে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, পুত্র-কন্যাকেও। সব... সব হারিয়েছেন। মর্মশোকে কেবলই বলতেন, 'সংসার বৃহৎ রঙ্গালয়। নাট্যরঙ্গালয় তাহারই ক্ষুদ্র অনুকৃতি।' লাট খেতে খেতে গাইতেন, 'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,/ কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।/ ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি/ কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।'

এত কষ্ট কেন? আয়, আমরা দু'জনে যেমন পারি, গান বাঁধি" "আমরা!" "হ্যাঁ আমরা, কেন পারব না?" গিরিশের কথা শুনে হতবাক সহচর উমেশচন্দ্র চৌধুরী! দু'জন ফিরছিলেন সে যুগের গীতিকার প্রিয়মাধব বসু মল্লিকের বাড়ি থেকে। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার শখের যাত্রাদল মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' পালা করবে। গান চাইতে গিয়েছিলেন। কিন্তু গান দেননি প্রিয়মাধব। অগত্যা দু'জনেই গান বাঁধলেন। গিরিশ লিখলেন, 'আহা! মরি! মরি!/ অনুপমা ছবি, মায়া কি মানবী,/ ছলনা বুঝি করে বনদেবী!' সেই বয়স থেকেই এমন চট-চলদি লিখে ফেলায় গিরিশ ছিলেন তুখড়।

একবার শনিবার রাতে মিনার্ভা থিয়েটারে 'প্রফুল্ল' হচ্ছে। ঠিক হল পরের শনিবার নতুন নাটক নামবে। গিরিশচন্দ্র ঠিক করলেন সেই রবিবারই তিনি নতুন নাটক লিখবেন! খবর দিলেন কলমচিকে। সে দিন 'প্রফুল্ল'-তে যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করেন আর গ্রিনরুমে এসে নতুন নাটকের কাহিনী-সংলাপ বলে যান। সেই রাতে গানও

লিখলেন। ফিরলেন শেষ প্রহরে। লেখা হয়ে গেল 'মণিহরণ'। বলতেন, "চোখে না দেখে কিছু লিখিনি"। যাঁরা তাঁর কলমচি ছিলেন, দেখেছেন, তার সেই ব্যথাকাতর সময়।

একবার তিনি মিনার্ভায়। স্বভাবমতো ঘুরতে ঘুরতে বলছেন। দ্রুত, লিখে নিচ্ছেন কলমচি অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি পরে তাঁর জীবনী লিখবেন। লেখার মাঝে প্রশ্ন করতেই গিরিশচন্দ্র বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন। রাগে কাঁপছেন। হাঁপানির জন্য কষ্ট হচ্ছে। শ্বাস নিতে কেঁপে কেঁপে উঠছেন। তবু নাটক লেখা চাই। হেমন্তকাল এলেই রোগ যেন বেড়ে যায়। সারা শীতকাল জুড়ে ভোগেন। কিন্তু কারও কথা শুনবেন না। লিখছিলেন, 'সিরাজদ্দৌলা'। বুকে, গলায় হাত দিয়ে চেপে ধরে বলছিলেন, 'ওহে হিন্দু-মুসলমান–/ এস করি পরস্পর মার্জনা এখন...।' "কী বললেন?" "আহা! ভাবনার মাঝে প্রশ্ন করে কী ক্ষতি করলে জানো! কত বার বলেছি, তবু মনে রাখতে পারো না। লেখার মাঝে থামলে সব গোলমাল হয়ে যায়।"

যাত্রার পরে নাটক নিয়ে পড়েন। ঠিক হল, দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'। চতুর্থ অভিনয়ের রাতে হাজির খোদ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। জড়িয়ে ধরলেন গিরিশকে। বাগবাজার ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে গেল হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার আর ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্ম। তবে এই সময় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পত্তনের ইতিহাস একটু অন্যরকম। সেও এক গল্প।

বাগবাজারের তরুণ জমিদার ভুবনমোহন নিয়োগী বেঙ্গল থিয়েটারে গ্রিনরুমে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন। নিজেই থিয়েটার খুললেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। গিরিশ বঙ্কিমের 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ দিলেন। চাকরিও করছেন। ইন্ডিয়ান লিগের হেড ক্লার্ক। এক বছর পরে গেলেন পার্কার কোম্পানিতে। তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছে, স্ত্রী সুরতকুমারী। হঠাৎ অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনে গোল ছড়াল থিয়েটার পাড়ায়। বন্ধ হল শো। দেনার দায়ে ডুবে ভুবনবাবু গিরিশকে অনুরোধ করলেন থিয়েটার লিজে নিতে। গিরিশ রাজি। তবে 'গ্রেট' নয়, নাম দিলেন 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার।' ঠিক করলেন প্রথম নাটক হবে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। তত দিনে জোড়াসাঁকোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মঞ্চনাটক 'সরোজিনী'তে অভিনয় করে বিনোদিনীও গাইছে রবিঠাকুর।

জ্বল জ্বল চিতা। দ্বিগুন, দ্বিগুন'। "কি রে বিনোদ এখান হইতে যাইল তোর মন কেমন করিবে না?" বিনোদিনী কী উত্তর দেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর ছোটবাবু মানে বেঙ্গল থিয়েটারের শরৎচন্দ্র ঘোষের কথায় তিনি চুপ করে ছিলেন। কী'ই বা বলবেন! সামনে দাঁড়িয়ে গিরিশ ঘোষ। তাঁরা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন নতুন দলের জন্য। বিনোদিনী নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "গিরিশবাবুর সহিত থিয়েটার আরম্ভ করিয়া বিডন স্ট্রীটের 'স্টার থিয়েটার' শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁহার সঙ্গে বরাবরের কার্য করিয়া আসিয়াছি। কার্য ক্ষেত্রে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন এবং আমি তাঁহার প্রথমা ও প্রধানা শিষ্যা ছিলাম।"

কেমন সম্পর্ক? বিনোদিনী লেখেন, "জোর জবরদস্তি, মান অভিমান, রাগ প্রায়ই চলত। তিনি আমায় অত্যধিক আদর দিতেন, প্রশ্রয় দিতেন"। "কি হল গিরিশবাবু! বারে, অমন করে তাকিয়ে থাকবেন?" "বনোদ! তোমাকে নিজের হাতে গড়ব। তুমি আমার সজীব প্রতিমা"। গিরিশের জীবনে যেন ঝেঁপে এলেন বিনোদিনী। তাঁর বিনি। মেয়ে লেখে, 'প্রেমডোর দিয়ে তারে বাঁধি অনিবার/ সে মালা কি ভালোবাসা প্রাণেশ আমার?' অমৃতলাল বসু 'অমৃত মদিরা'য় সেই সব দিনের কথায় লিখছেন, "গিরিশের পদাবলী রোম্যান্সের মেলা/ কবিতা লিখায়ে তাই বিনি করে খেলা/ হাসির কথায় নিশ হয়ে গেছে ভোর/ তথাপি ওঠে না কেহ ছাড়িয়া আসোর।"

গিরিশ বিনোদকে খুব বিশ্বাস করতেন। বিনোদও মানুষটার সামনে তাঁর সব গ্রন্থি আলগা করে দেন। এক দিন বিনোদ চুপটি করে শোনেন হর-পার্বতী গল্প। রাত বাড়ে। নেশা ভেজানো গলায় গিরিশ শোনান তাঁর নাটক 'আগমনী'।

গিরিশের ভাগ্য বিড়ম্বিত।

খরচের বোঝা বইতে বইতে একসময় ন্যাশনাল থিয়েটার বিকিয়ে গেল। কিনলেন প্রতাপচাঁদ মুহুরি। ১০০ টাকায় গিরিশ সেখানে ম্যানেজার।

দিন-রাত নাটক লিখছেন তিনি।

অক্লান্ত!

'৮২-তে ৭টি পৌরাণিক নাটক, সঙ্গে চলছে আকণ্ঠ মদ্যপান। অমৃতলাল লিখছেন, 'আমি আর গুরুদেব (গিরিশ) যুগল ইয়ার/বিনির (বিনোদিনী) বাড়িতে যাই খাইতে বিয়ার।' শেষ হলে ফের আনা হয় 'বি-ফাইভ ব্রান্ডি।'

হাঁটুতে মুখ রেখে স্থির হয়ে বসে আছেন বিনোদিনী। তাঁর চোখ লাল, খোলা চুল, এলোমেলো শাড়ির কুঁচি-আঁচল, থমথমে ঘর-দুয়ার। বিনোদ থিয়েটার ছেড়ে দিতে চান। গিরিশ আর অমৃত তাঁকে বোঝাচ্ছেন। কোনও কথাই যেন বিনোদের কানে ঢুকছে না। তাঁর কেবল মনে পড়ে যাচ্ছে প্রতাপ জুহুরির কুৎসিত ভাষা, চোখের ইঙ্গিত। বিনির কি দোষ! পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে কাশী গিয়েছিলেন। ফিরতে দেরি হয়েছে। তাই বলে ছুটির মাইনে দেবেন

না। বিনোদিনীর সঙ্গে গিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন গিরিশও। প্রতাপকে বলেছিলেন, "মাইনে না দিলে বিনোদ কিন্তু কাজ করবে না।"

"মাইনা কেয়া?"

গিরিশ হতবাক প্রতাপের কথা শুনে। ঘেন্নায় গা রি রি করছিল বিনোদের। বটে মাহিনা দেবে না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে চলে এসেছিলেন বিনোদ। কিন্তু সে চলে গেলে এখন যে খুব বিপদ হয় গিরিশের, দলের সবার। গিরিশ বোতল নিঃশেষ করে বিনোদকে আদর করে বোঝাতে গেলেন, তিনি জানেন তাঁর কথা এই মেয়ে ফেলবে না। গিরিশ বাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে 'না' বলতে গিয়ে ঠোঁট কেঁপে উঠল বিনোদের। পারল না তাঁর বিনি।

অমৃত মিত্র বললেন, "দেখ বিনোদ, এখন গোল করিস না। একজন মাড়োয়ারির ছেলে নতুন থিয়েটার করতে চায়। যত টাকা লাগে সে খরচ করবে। কিছু দিন চুপ করে থাক, দেখ কী হয়।" কিছুদিন পরে ন্যাশনাল ছেড়ে দিলেন গিরিশ, ছাড়লেন বিনোদিনীও।

কলকাতায় তখন নটী বিনোদিনীর ঢলঢলে রূপের বেশ কদর। সব পুরুষই তাঁকে ছুঁতে চায়। ছোঁয়া কী সহজ। মুগ্ধ মাড়োয়ারি ঘরের ছেলে গুর্মুখ রায়। ৬৮ বিডন স্ট্রিটে লিজের জায়গায় তিনি তৈরি করলেন পাকা মঞ্চ। ঠিক ছিল নাম দেবেন, বিনোদিনীর নামে। কিন্তু হল কই? গড়ে উঠল স্টার থিয়েটার। সকাতরে বিনোদিনী দাসী লিখছেন স্টার-কথা, "সকলে চলিয়া যাইলে আমি নিজে ঝুড়ি করিয়া মাটি বহিয়া পিট, ব্যাক সিটের স্থান পূর্ণ করিতাম।... আমার সেই সময় আনন্দ দেখে কে? সকলে আমায় বলেন যে, 'এই যে থিয়েটার হাউস হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যোগ থাকিবে।' কিন্তু কার্যকালে উঁহারা সে কথা রাখেন নাই কেন– তাহা জানি না।"

বিনির মন খারাপ। সকলে ঠকিয়েছে তাঁকে। গিরিশ জানেন কি করে দুলালির মন ভাল করতে হয়। বিনোদকে 'সতী' চরিত্রে রেখে লিখলেন 'দক্ষ যজ্ঞ' নিজে সাজলেন 'দক্ষ'।

কিন্তু বেশি দিন সুখ সইল না। বিনোদিনীকে সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসেবে দাবি করে স্টারে টাকা ঢেলেছিল যে গুর্মুখ রায়, সেও সরে গেল। ভেঙে গেল 'স্টার'-এর স্বপ্ন।

এগারো হাজার টাকায় স্টার হস্তান্তরের ব্যবস্থা করলেন দলের কয়েক জনের নামে। কিন্তু নিজে মালিক হলেন না। কেন না, অনুজ অতুলকৃষ্ণকে কথা দিয়েছিলেন, থিয়েটারে যতদিন থাকবেন, কখনও নিজে মালিক হবেন না। মালিকানা বদল হলেও নাটক থেমে রইল না। কিন্তু গিরিশের ভিতরে ভিতরে অস্থিরতা যেন বেড়েই চলেছে। বুক জুড়ে জ্বালা, রোগে-শোকে দহিত তিনি, মুক্তি মেলে না। কালীঘাটে ফি সপ্তাহে শনি-মঙ্গলবার হাড়কাঠের কাছে বসে সরারাত্তির জগদম্বাকে ডাকতে থাকেন। উচ্চারণ করেন মাতৃনাম, 'কালী করালবদনা'। পথের লোককে জিজ্ঞেস করেন , "মুক্তি কিসে গো?" গিরিশের দিকে তাকিয়ে হাসছেন ঠাকুর। নাচতে নাচতেই হাসছেন। ভাব-কোমল নৃত্য, রাম দত্ত খোল বাজাচ্ছেন। আর পরমহংস নাচছেন। দু'হাত তুলে ঠাকুর গাইছেনও, 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।/নদে টলমল...।' গাইতে গাইতেই সমাধি নিলেন ঠাকুর। তিনি চোখ খুলতে গিরিশ ঠাকুরকে ফের জিজ্ঞেস করলেন, "আমার মনের বাঁক যাবে?" ঠাকুর বললেন, "যাবে"। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না গিরিশের! তিনি বার বার জিজ্ঞেস করছেন। ঠাকুর হেসে তিন সত্যি করলেন। এ প্রথম নয়। গিরিশের যখন চল্লিশ, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সেই প্রথম দেখা তাঁর।

এক সন্ধ্যায় পরমহংসকে বারবার 'সন্ধে হল, সন্ধে হল' জিজ্ঞেস করতে দেখে বলেছিলেন, "ঢং দেখো, সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জ্বলিতেছে, তবু উনি বুঝিতে পারিতেছেন না।" আরেক বার বলরাম বসুর বাড়িতে দেখে পালিয়ে এসেছিলেন। ঠাকুরের তাঁর তৃতীয়বার দেখা ১৮৮৪-তে। 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখতে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। স্টার থিয়েটার। ২০ সেপ্টেম্বর। মঞ্চে চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনী বৈষ্ণবনৃত্যের পরে যখন 'কৃষ্ণ কই-কৃষ্ণ কই' বলে জ্ঞান হারালেন দর্শক বৃন্দাবনী প্রেমে ভাসল। নাটক শেষ। বিনোদিনীর 'নিমাই' দেখে তাঁর মাথায় হাত রেখে পরমহংস বললেন, "তোর চৈতন্য হোক।" আর গিরিশের? দু'জনে বসে আছেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে। মন উচাটন গিরিশের। পরমহংস গিরিশকে বললেন, "এখন থেকে এদিক-ওদিক দু'দিক রেখে চল। তারপর যদি এই দিক ভাঙ্গে তখন যা হয় হবে। সকালে-বিকালে স্মরণ-মননটা একটু রাখিস, পারবিনে?" গিরিশ চুপ করে থাকেন। ভাবেন এ কেমন বাঁধাবাধি। বললেন, "যদি কথা রাখিতে না পারি?" ঠাকুর বললেন, "তবে আমায় বকলমা দে। শ্রীভগবানে পাপ-পুণ্যের ভার দিয়ে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ কর।" গিরিশ এবার রাজি হলেন। ঠাকুরের অপার করুণায় চোখে জল গিরিশের। হাপুস নয়নে কাঁদছেন তিনি।

মেঘ যেন ঘনিয়ে এল ফের। 'বেল্লিক বাজার' নাটকের প্রথম রাতের অভিনয়ের পরে থিয়েটার ছেড়ে দিলেন বিনোদিনী। প্রিয়জনের 'ছলনার আঘাত' তিনি ভুলতে পারেননি। অন্য দিকে গোপাললাল শীল নামে এক ব্যক্তি স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নিলেন। গিরিশের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল যেন। ত্রিশ হাজার টাকায় পুরনো স্টারকে বিক্রি করে এ বার গিরিশ অনুগামীরা চলেন হাতিবাগানে। যেন পুনর্জন্ম স্টার থিয়েটারের। সে সময়

গোপাললালের 'এমারেল্ড'-এ গিরিশ মাসিক তিনশো পঞ্চাশ টাকার কাজ করেছেন। সে টাকাও তিনি পাঠাতেন পুরনো দলকে। প্রতিদানে কি পেলেন? কী-ই বা পেতেন। মাসে একশো টাকা মাইনে। আর দৈনিক চার পয়সার তামাক। জুটল ক্ষত।

প্রিয় শিষ্যদের কাছ থেকে লাঞ্ছনা-অপমান। স্টারে ফিরলে গিরিশ ঘোষকে তাড়িয়ে দিলেন তাঁরই শিষ্যরা। বরখাস্ত হলেন। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে অঙ্গীকার করতে বাধ্য হলেন বৃদ্ধ নট, স্টারের শর্তে। গিরিশ কথা দিলেন, মাসে ১০০ টাকা পেনশনের বিনিময়ে আর কোথাও কখনও থিয়েটার করবেন না! কখনও না।

'মমতা এস না বক্ষে মম/ জ্বল জ্বল রে অনল/ প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে।'

পারলেন না।

তিনি লিখলেন, 'জনা'। ক্ষত মেটাতে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তার আগেই জন্ম হল মিনার্ভার। অভিনয় হল অনুবাদে ম্যাকবেথ। স্থির হতে পারছেন না। উইংসের আড়াল থেকে কে জেন তাঁকে ডাকছে! বিনোদ না! প্রতি মুহূর্তে নিজেরই তৈরি করা চরিত্রেরা বুঝি কথা বলছে ফিসফিস হাওয়ায়। তাদের সংলাপ, হাসি, কান্না, ক্যাকফনি হয়ে মিশে যাচ্ছে গিরিশের বুকের জ্বালায়, হাহাকারে! আর্তরবে!

থিয়েটার পাড়ার পথের হাওয়ায় তখন গিরিশকে নিয়ে স্টার থিয়েটারের হ্যান্ডবিল উড়ছে! ধুলোয় লাট খাচ্ছে কাগজগুলো। তাতে লেখা, 'তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়।' গিরিশ হাসছেন!

পঁয়তাল্লিশ বছরের অভিনয় জীবন। কখনও লিখবেন না?

হেসে উঠতেন নট। দমকা কাশি সামলে আত্মজীবনী লেখার অনুরোধ ফিরিয়ে দিতেন। বলতেন, "সে বড় সহজ কথা নয় হে। বেদব্যাসের মতো যেদিন অকপটে আত্মদোষ বলতে পারব, সেদিন লিখব।" শেষ কয়েক বছর কাটে 'মিনার্ভা', 'ক্লাসিক'-এ।

'ক্লাসিক'-এ থাকতেই একদিন চললেন তারকেশ্বরে মেয়ের জন্য পুজো দিতে। কলকাতায় যখন ফিরলেন, ততক্ষণে সব শেষ! শুনলেন দাহ হয়ে গিয়েছে মেয়ের দেহ! দুমড়ে উঠল বুক। কান্না হাহাকার হয়ে ভিজিয়ে দিল দু'চোখ! দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চলে যাওয়ার পরে বহু কষ্টে-যত্নে-আদরে মানুষ করেছিলেন সেই শিশুটিও এভাবেই চলে গিয়েছিল! সারদামায়ের স্পর্শও তাকে ফেরাতে পারেনি। আর জীবনের এই অবেলায় চলে গেল মেয়ে। আর কত!

তাঁর শেষ অভিনয় করলেন ১৯১১-তে। নাটক 'বলিদান'-এ করুণাময়ের চরিত্রে। সেদিন খুব বৃষ্টি। হাঁপের টান নিয়ে বার বার খালি গায়ে স্টেজে আসতে হচ্ছে গিরিশকে। অসুস্থ হলেন। রোগশয্যায় নিবেদিতাকে উৎসর্গ করে লিখলেন শেষ নাটক 'তপোবল'।

বুকের জ্বালা যেন বেড়েই চলেছে। ঘুম নেই, সারাক্ষণ বসে থাকেন আর বলেন, "প্রভু, আর কেন, শান্তি দাও, শান্তি দাও, শান্তি দাও!"

চলেই গেলেন।

ফেব্রুয়ারি, ১৯১২।

বৃষ্টিতে ছেয়ে রয়েছে আকাশ। তার পেয়ে ফরিদপুর থেকে ফিরলেন ছেলে দানিবাবু। গহন রাত। মহল্লা মাতোয়ারা সংকীর্তনে।

শেষ সময় গিরিশের মৃদু কণ্ঠে শোনা গেল শ্রীরামকৃষ্ণ–নাম! ❑

ঋণ: গিরিশচন্দ্র (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদনা স্বপন মজুমদার), পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত), গিরিশ রচনাবলী (সম্পাদনা রথীন্দ্রনাথ রায় ও দেবীপদ ভট্টাচার্য), বাই-বারাঙ্গনা গাথা (সমন্বয় ও সম্পাদনা দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়), বিনোদিনী রচনাসমগ্র (সম্পাদনা দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়)

(বেদ রহস্য– ১২৯ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

বেদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঋক্ বা সূক্তকে আধার করিয়া নানান ইতিহাস গঠন করিতেন, ইহাদেরও ঠিক সেই প্রণালী। তবে বিচিত্র অতিপ্রাকৃত ঘটনায় ভরা বিচিত্র গল্প না বানাইয়া, জার (জরপুত্র) বৃষ ঋষির সারথ্যে ব্রাহ্মণকুমারের রথচক্রে নিষ্পেষণ, যন্ত্রপ্রয়োগে পুনর্জীবন দান, পিশাচীকৃত অগ্নিতেজের হরণ ইত্যাদি ইত্যাদি অদ্ভুত কল্পনা না করিয়া আর্য্য ত্রিৎসুরাজ সুদাসের সঙ্গে মিশ্রজাতীয় দশজন রাজার যুদ্ধ, একদিকে বশিষ্ঠ অপরদিকে বিশ্বামিত্রের পৌরোহিত্য, পর্ব্বতগুহানিবাসী দ্রাবিড় জাতি দ্বারা আর্য্যদের গাভী হরণ ও নদীর স্রোত বন্ধন, দেবশুনি সরমার উপমা-ছলে দ্রাবিড়দের নিকট আর্য্যদৌত্য বা রাজদূতী প্রেরণ, প্রভৃতি সত্য বা মিথ্যা সম্ভব ঘটনা লইয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন। এই প্রাকৃতিক ক্রীড়ার পরস্পরবিরোধী রূপকের আর তাহার সঙ্গে এই ইতিহাস সম্বন্ধী রূপকের মিল করিতে গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী বেদের যে অপূর্ব্ব গোল করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। তবে তাঁহারা বলেন না কি, আমরা কি করিব, প্রাচীন বর্ব্বর কবিদের মন গোলমেলে ছিল, সেই জন্যই এইরূপ গোঁজামিল করিতে হইয়াছে, আমাদের ব্যাখ্যা কিন্তু ঠিক, খাঁটি, নির্ভুল। সে যাহাই হৌক, ফলে প্রাচ্য পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় বেদের অর্থ যেমন অসংলগ্ন গোলমেলে দুরূহ ও জটিল হইয়াছিল, পাশ্চাত্যদের ব্যাখ্যায় সেইরূপই রহিয়াছে। সবই বদলাইয়াছে, অথচ সবই সমান। টেমস, সেন (Seine) ও নেবা (Neva) নদীর শত শত বজ্রধর আমাদের মস্তকের উপর নব পাণ্ডিত্যের স্বর্গীয় সপ্তনদী বর্ষণ করিয়াছেন সত্য, তাঁহাদের কেহও বৃত্রকৃত অন্ধকার সরাইতে পারেন নাই। আমরা যেই তিমিরে, সেই তিমিরে। ❑

অবধূতের দর্শনে চব্বিশ গুরু: অথচ এঁরা কেউই কানে মন্ত্র দিলেন না

জয়ন্ত কুশারী

কানে মন্ত্র দিলেন না। হয়ে গেলেন গুরু। এও মানতে হবে? তাও নন এক দু'জন, দু'ডজন। একেবারে। এমনই চব্বিশজন গুরুর হদিশ দিলেন অবধূত। আপনারা শুনবেন? আমি বলব। 'অবধূত' শব্দটির প্রতীকী অর্থ হল সাধক বা তপস্বী। সাধনার মূল কথা মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ। তার জন্য প্রয়োজন মনের ব্যায়াম। মনকে প্রতিনিয়ত বোঝাতে হয় যুক্তি, বিশ্লেষণ ও ন্যায়-অন্যায় বোধকে সদাজাগ্রত রেখে। সাধনার পথে চলতে অনেক নির্দেশ মানতে হয়। সেই নির্দেশ যাঁরা দেন তাঁরা সকলেই গুরু। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গুরু একজন। যিনি কানে মন্ত্র দেন। 'মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্র'। যা মননের মধ্যে মুক্তিলাভ হয়। তাই সার্থক সাধকের অনেক গুরু। অনেকের যুক্তি ধারা বা আচার-আচরণ কিংবা তাঁদের প্রকৃতি থেকে সাধক অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন। যা সাধককে সিদ্ধিলাভের পথে এগিয়ে দেয়। সাধনার বহুমুখ। মনকে নিজের বশে রাখার জন্য অনেক যুক্তি ও পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। এখানেই বহু গুরুকরণের সার্থকতা। 'অবধূত' এই রকম একজন সাধক যাঁর সব জানালা উন্মুক্ত। যেখান থেকে যেটুকু জ্ঞানালোক প্রবেশ করে তাতেই তাঁর মনের গভীর অন্ধকার কেটে যায়। তাঁর অন্তর্দেশ থেকে অজ্ঞতা দূরীভূত হয় এবং তিনি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হন। কথা চলতে চলতে 'কথার কথা' হয়। সেইরকমই এক 'কথার কথা' হল 'অবধূতের চব্বিশ গুরু'। গণিতের হিসেব ঠিক রেখে তাঁর গুরুদের একটি নাতিদীর্ঘ পরিচয় তালিকা তুলে ধরলাম।

সাধনার মূল কথা মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ। তার জন্য প্রয়োজন মনের ব্যায়াম। মনকে প্রতিনিয়ত বোঝাতে হয় যুক্তি, বিশ্লেষণ ও ন্যায়-অন্যায় বোধকে সদাজাগ্রত রেখে। সাধনার পথে চলতে অনেক নির্দেশ মানতে হয়। সেই নির্দেশ যাঁরা দেন তাঁরা সকলেই গুরু। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গুরু একজন। যিনি কানে মন্ত্র দেন।

অবধূতের প্রথম গুরু : পৃথিবী। পৃথিবী সর্বং সহা। তিনি সব কিছু সহ্য করেন। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধে, মহামারিতে, দুর্ভিক্ষে, টাইফুনে, সুনামিতে, ভূমিকম্পে, সন্ত্রাসে ধরিত্রী সন্তানেরা হত হয়েছে। মা পৃথিবী সব মুখ বুজে সহ্য করেছেন। কেন সহ্য করছেন? বিধাতার এই বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভার রক্ষা করার জন্য।

অবধূতের দ্বিতীয় গুরু : বায়ু। বায়ু নির্লিপ্ত। বায়ু নিজে গন্ধময় না হয়ে, সুগন্ধ-দুর্গন্ধ উভয় গন্ধই বহন করে।

তৃতীয় গুরু : আকাশ। আকাশ অনন্ত, অসীম, ঘটস্থ আকাশ সসীম। সব ঘট ভেঙ্গে গেলে অসীম আকাশ আবার অসীমে বিলীন হয়। তিনি সান্তও বটে, অনন্তও বটে।

চতুর্থ গুরু : জল। জল দিয়ে ধুলে মলিন বস্তু মালিন্যমুক্ত হয়। কিন্তু জল নিজে নির্মল থাকে। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণুর মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয় জল। জলের তিনটি রূপ– জল, বরফ, বাষ্প।

পঞ্চম গুরু : অগ্নি। অগ্নি সর্বভুক এবং দাহিকা শক্তিসম্পন্ন। অগ্নি সকল বস্তুকে দগ্ধ করতে পারে। নিজে কিন্তু দগ্ধ হয় না। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জন্মদাতা অগ্নি।

ষষ্ঠ গুরু : চন্দ্র। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু চন্দ্রের কিছু হয় না।

সপ্তম গুরু : সূর্য। সূর্য সকল জাগতিক শক্তির উৎস। বৃক্ষের প্রতিটি পাতা তার রান্নাঘর। পাতার ক্লোরোফিল সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্যে অনুঘটক জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে বাতাসের দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বিশ্লেষণ করে তার কার্বন পরমাণুটি আত্তীকরণ করছে। জীবজগতের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সূর্য না থাকলে সম্ভব হতো না।

অষ্টম গুরু : কপোত-কপোতী। কপোত-কপোতী মায়াবদ্ধ অস্তিত্বের প্রতীক। ব্যাধের বিছানো জালে আটকা-পড়া সন্তানদের উদ্ধার করতে প্রথমে কপোতী ধরা পড়ল জালে। স্ত্রী-সন্তানদের দুর্দশাগ্রস্ত দেখে মায়ায় আবদ্ধ কপোতও বিপদ মুক্ত করতে গেলে একই দশাপ্রাপ্ত হল। আমরা সকলে এইভাবে মায়ায় জড়িয়ে পড়ছি।

নবম গুরু : অজগর। অজগরের বৈশিষ্ট্য হল সে তার নিজের বাসস্থানের কাছে যা পায় তাই খেয়ে খিদে মেটায়। অধিক খাদ্যের জন্য সে লালায়িত নয়।

দশম গুরু : সমুদ্র। সমুদ্র পরিপূর্ণ। তার সীমানা স্থির। নদীর জল প্রবেশ করলে সমুদ্রের সীমানার হেরফের হয় না।

একাদশ গুরু : পতঙ্গ। আগুনের জৌলুসে পতঙ্গ মোহগ্রস্ত হয়ে পুড়ে মরে। তেমনি মূর্খ ব্যক্তি নারীর রূপের ছটায় মুগ্ধ হলে শেষ পর্যন্ত বিনষ্ট হয়।

দ্বাদশ গুরু : মধুকর। বহু পরিশ্রমে সঞ্চিত (মৌমাছির) মধুর ভাণ্ডার, মৌচাকটি ভেঙ্গে মধু নিয়ে যায় অন্যব্যক্তি। তাই সাধকের অকারণ-সঞ্চয় বর্জনীয়।

ত্রয়োদশ গুরু : করিণী (স্ত্রী হাতি)। করী (পুরুষ হাতি) করিণীর মোহে তৃণাচ্ছাদিত গর্তে পড়ে বন্দি জীবনযাপন করে। তাই তপস্বী সংসারজীবনে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় মাটির স্ত্রীমূর্তিও দর্শন করবেন না। মা সারদা বলেছেন, 'সন্ন্যাসী কখনও কাঠের স্ত্রী মূর্তিও স্পর্শ করবে না।'

(পরবর্তী অংশ ১২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আমেরিকায় শারদোৎসব

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

প্রবাসে দীর্ঘকাল এক সমান্তরাল জীবনযাপনে অভ্যস্ত বাঙালির দুর্গাপুজোর ছুটি বলে কিছু নেই। দেশে যখন পুজোর ছুটি, এখানে তখন গ্রীষ্ম অবকাশের শেষে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি খুলে গিয়েছে। তবু পুজোর সময় আসে কাছে। মহালয়ার পরে দেবীপক্ষে নির্ধারিত দিনে পুজো হয় রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, আদ্যাপীঠ আর আমেরিকার কয়েকটি শহরে বাঙালি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে। খুব অল্প সংখ্যক হলেও কোনও কোনও বাড়িতেও তিথি অনুযায়ী দুর্গাপুজো, নয়তো এপ্রিল মাসে বাসন্তীপুজো হয়। তবে সারা আমেরিকায় বারোয়ারি পুজোর সংখ্যা প্রায় দুশোর কাছাকাছি পৌঁছেছে। ১৯৭১ সালে যখন নিউইয়র্কে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির হলে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল, সেই সময়ের সাক্ষী হিসেবে এখন বারোয়ারি পুজোর ব্যাপক আয়োজন আর জাঁকজমক দেখে একই সঙ্গে আনন্দ ও বিস্ময় বোধ হয়।

পুজোর আমন্ত্রণপত্রটি এখনও ট্র্যাডিশনাল। কম্পিউটারে 'ইন-ভাইট' -এর চিঠি নয়, কয়েকদিন ধরে বাড়ির ডাকবাক্সে এসে পৌঁছায় নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, কানোটিকাটের সর্বজনীন দুর্গোৎসবের আমন্ত্রণপত্র। অধিকাংশ পুজো হয় দেবীপক্ষের শুক্র, শনি, রবিবার নিয়ে। আমন্ত্রণপত্রে পুজোর দিনক্ষণ, অঞ্জলির সময়, প্রসাদ, ভূরিভোজনের সময় আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচি দেওয়া থাকে। সবই দুর্গার নতুন নতুন ছবি দিয়ে ইংরেজিতে লেখা। শুধু বাংলায় লেখা একটি মাত্র আমন্ত্রণপত্র আসে নিউইয়র্কের কুইনস্ এলাকার 'বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির' থেকে। দেবীপক্ষের তিথি অনুযায়ী সেই দুর্গাপুজোর চিঠির শুরুতে লেখা থাকে– "সধর্ম পরিপোষক– ভক্ত সজ্জনমণ্ডলী, সুধী"... ইত্যাদি, ইত্যাদি। সেই পুজোতে গিয়ে বোঝা যায়, নিউইয়র্ক ও উপকণ্ঠের শহরগুলিতে কী বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি হিন্দু আছেন।

সেবার পুজো পড়েছিল অক্টোবরের শেষদিকে। খোলা মাঠে কনকনে শীতের হাওয়া। আকাশের দিকে মুখ তুলে একদল উচ্ছ্বসিত হয়ে মেগা তুবড়ি, আলোর মালা দেখছিল বটে। কিন্তু মাথায় শাল মুড়ি দেওয়া সিনিয়র সিটিজেনদের তখন উভয় সংকট।

এদেশের বারোয়ারি পুজোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পী, ক্লাবের সদস্যরা সপরিবারে অংশ নিলেও, 'ওভারসিজ আর্টিস্ট' না এলে জলসাঘর মাটি হয়ে যাবে। কালচারাল প্রোগ্রাম, আর সন্ধেবেলার এলাহি পাঁঠার মাংস, পোলাও, কালিয়ার ওপর নির্ভর করে, কোন্ পুজো কত বেশি লোক টানতে পারবে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সিতে দু'তিন সপ্তাহ ধরে পাঁচ/ছয়টি করে পুজো হয়। নদীর এপারে ইমন, তো ওপারে রূপংকর। এপারে 'দোহার' তো ওপারে 'কায়া ব্যান্ড'। এপারে সাহেব চ্যাটার্জি, ক্ল্যাসিকালের সন্দীপ ভট্টাচার্য, মুম্বাই-এর সোনা মহাপাত্র তো, ওপারে দোয়েল গোস্বামী, দীপায়ন ব্যানার্জি। এ তো হল এ বছরে হাডসন নদীর দুপারের পুজোর জলসার কথা। সারা আমেরিকায় অন্যান্য বাঙালি-প্রধান এলাকাতেও প্রতিবছর ঘুরেফিরে ওভারসিজ আর্টিস্টরা আসছেন। ইদানীং 'ধামাকা'র প্রতিশ্রুতি দিলে দারুণ ভিড় হচ্ছে। তবে ধামাকার রিহার্সাল বা প্রস্তুতিপর্বে কর্ণপটহে দমাদ্দম আঘাত সহ্য করার বদলে সাময়িক হল ত্যাগ করা নিরাপদ। নিউজার্সির সর্বপ্রথম ও বৃহত্তম দুর্গাপুজো 'কল্লোল' অবশ্য সাময়িক পরিত্রাণের বন্দোবস্ত করেছিল। রবিবারের শেষ অনুষ্ঠান তথা ধামাকার আগে, বাইরের মাঠে আতসবাজি প্রদর্শন। একদিকে মুম্বাই-এর আর্টিস্টের জন্যে স্টেজ সেট-আপ, সাউন্ড ইত্যাদি নিয়ে তুমুল বাজনাবাদ্যি বাজছে। আর হাজার-বারোশো দর্শক তখন হল খালি করে দিয়ে (প্রায় বাধ্যতামূলক আইন) বাজি পোড়ানো দেখতে যাচ্ছে। সেবার পুজো পড়েছিল অক্টোবরের শেষদিকে। খোলা মাঠে কনকনে শীতের হাওয়া। আকাশের দিকে মুখ তুলে একদল উচ্ছ্বসিত হয়ে মেগা তুবড়ি, আলোর মালা দেখছিল বটে। কিন্তু মাথায় শাল মুড়ি দেওয়া সিনিয়র সিটিজেনদের তখন উভয় সংকট। বাইরে থাকলে নিউমোনিয়া। হলে ঢুকলে কানে তালা। তবে অনুযোগ করার কিছু নেই। তিন রাতের জলসায় প্রভূত রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল, আধুনিক, রিমেক নষ্ট্যালজিক, ভরতনাট্যম, কুচিপুড়ি, লোকনৃত্য, ছোটদের বাংলা নাটক, বড়দের 'দমফাটা হাসির নাটক' এক ঘণ্টার ক্ল্যাসিক্যাল গান-বাজনা কি-ই না উপহার দেওয়া হয়েছে? দশমীর পুজোর পরে ঢাকের বাদ্যির তালে তালে ধুনুচি নাচ, হোলিখেলার মতো সিঁদুর খেলা, সারা অডিটোরিয়াম জুড়ে হাতে হাত ধরে মহিলাদের দুলকি নাচ। সেই ভিড় ভেদ করে 'আসছে বছর আবার হবে' ধ্বনি দিতে দিতে মা দুর্গাকে সপরিবারে মণ্ডপ থেকে নামিয়ে আনা– এ সবই তো পুজোবাড়ির আনন্দ। তবে এ বছর আনন্দময়ীর নৌকায় আগমনে জলবৃদ্ধির ফলাফল পুজোর আগেই বুঝেছে দক্ষিণের রাজ্য টেকসাস আর ফ্লোরিডার বাঙালি বাসিন্দারা। প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ঝঞ্ঝা বন্যায় শহরগুলি বিধ্বস্ত। হিউস্টনে হ্যারিকেন 'হার্ভে', তারপরে মায়ামি সহ ফ্লোরিডার উপকূলবর্তী শহরগুলিতে দ্বিতীয় ঝড় 'আর্মা'– দুই প্রাকৃতিক বিপর্যয় বেশ কিছু বাঙালি পরিবারকে সাময়িকভাবে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। ক্রমশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ বছরের দুর্গাপুজো প্রসঙ্গে খবর নিতে জানা গেল হিউস্টনের দুর্গাবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতুর দুর্গামূর্তির দেবীপক্ষের পুজো বিধিমতেই হচ্ছে। তারপর উইকএন্ডে বারোয়ারি পুজো। ফ্লোরিডার মায়ামি আর অরল্যান্ডোতে গত বছর সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যার জন্যে

দুর্গাপুজো কোনও মতে সম্পন্ন হয়েছিল। এ বছর 'আর্মা' ঝড়ের তাণ্ডবের পরেও মায়ামিতে ভারতীয় বাঙালি আর বাংলাদেশি হিন্দুদের দুটি পুজোই সময় মতো হচ্ছে। অরল্যান্ডোর বেঙ্গলি সোসাইটি অব ফ্লোরিডা অন্যান্য বছরের মতো দুর্গাপুজো করছে। তাদের শারদীয় বাংলা পত্রিকার নাম 'অভিযান'। নিউজার্সির 'কল্লোল', ওয়াশিংটনের সংস্কৃতি ও শারদীয় বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করে। তবে 'কল্লোলে'র দুর্গাপুজোয় আতসবাজির হাউই, তুবড়ি, আকাশে আলোর মালাটালা সব এ বছর বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও ফায়ার ডিপার্টমেন্টের মস্ত ট্রাক পুজোবাড়ির ছোট মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতো। তবু নিরাপত্তার যুক্তিটুক্তি দেখিয়ে শহরের মিউনিসিপ্যালিটি থেকে পারমিট দেয়নি। অতএব, হলের মধ্যে বসে থেকে 'ধামাকা'র জগঝম্প। অবশেষে সোনা মহাপাত্র'র সুকণ্ঠের গান শোনা। এমন নয় যে, পুজোয় ফাংশান আর ভূরিভোজনেই শুধু হাজার হাজার ডলার খরচ হয়। দেবীর বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত মণ্ডপে পুজোসামগ্রী থেকে নৈবেদ্য, ভোগ, কোনও আয়োজনেই শুধু হাজার ডলার খরচ হয়। দেবীর বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত মণ্ডপে পুজোসামগ্রী থেকে নৈবেদ্য, ভোগ, কোনও আয়োজনেরই যাতে ত্রুটি না হয় তার দায়িত্ব নেন ডজন খানেক মহিলা কনভেনর। একসময় কত উপচারের বিকল্প খুঁজতে হ'ত। এখন আমপাতা, বেলপাতা, তুলসীপাতা, জবার মালা, সন্ধিপুজোর জন্যে একশো আটটি স্থলপদ্ম, প্ল্যাস্টিকের বোতলসুদ্ধ হৃষীকেশ, হরিদ্বারের গঙ্গাজল, দশকর্ম ভাণ্ডার থেকে দেওয়া যত কিছু উপচার–সবই তিন দিন মণ্ডপে সাজিয়ে রাখা থাকে। হোমের পরে ভস্মের ফোঁটা কপালে নিতে অজস্র মানুষের লম্বা লাইন। জরির টুপি পরা ছোট্ট ছেলেকে কোলে নিয়ে অবাঙালি যুবকের হাসিমুখ– 'পণ্ডিতজি, এক টিকা চড়া দিজিয়ে।' এক টিকাতে হয় না। বাঙালি পণ্ডিতজি হাতে ভস্মের বাটি নিয়ে মণ্ডপ থেকে ঝুঁকে পড়ে ছোট্ট জরির টুপি পরা খোকার কপালেও টিপ দিয়ে যান। ❑

(অবধূতের দর্শনে চব্বিশ গুরু... মন্ত্র দিলেন না– ১১৮ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

চতুর্দশ গুরু : ভ্রমর। মৌমাছি যেমন সকল পুষ্প থেকে মধু সংগ্রহ করে। বিজ্ঞব্যক্তি তেমনই সকল শাস্ত্র থেকে সার সংগ্রহ করবেন। আর সাধক সকল ধর্মের সার অনুধাবন করবেন।

পঞ্চদশ গুরু : হরিণ। ব্যাধের সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে হরিণ ব্যাধের জালে আটকা পড়ে। সাধকেরও উচিত স্ত্রীলোকের নৃত্যগীতে আকৃষ্ট না হওয়া।

ষোড়শ গুরু : মৎস্য। কেঁচোর লোভে বড়শিটি মাছের গলায় বিঁধে যায়। মাছ ধরা পড়ে। তাই রসনা ইন্দ্রিয়ের সংযম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে স্বাস্থ্য রক্ষার দৃষ্টিতে ও সুস্থ থাকার তাগিদে।

সপ্তদশ গুরু : পিঙ্গলা। বারবণিতা পিঙ্গলা ঘর বাঁধতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়। ফলত সে আশা ছেড়ে সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করে এবং সুখ লাভ করে।

অষ্টাদশ গুরু : কুরর (চিল, কাক ইত্যাদি)। চিলের মুখের মাছটি না পাওয়া পর্যন্ত একদল কাক পিছু নিয়েছিল। চিল বুঝল এই মাছটা ঘিরে এত অশান্তি। তখন সে মাছটি তাদের দিয়ে দিল। বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত হলে অকারণ অশান্তি এড়ানো যায়।

ঊনবিংশ গুরু : বালক। বালক আত্মক্রীড় ও আত্মকাম। সে নিজের খেলাতেই নিজে বিভোর। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন 'আপনাকে আপনি থেকো মন, যেও না কারো ঘরে'।

বিংশ গুরু : কুমারী। এক কুমারীর হাতে অনেকগুলো কঙ্কন থাকার ফলে কঙ্কনে-কঙ্কনে ঠোকাঠুকিতে ঠুংঠাং শব্দ লেগেই থাকত। তাই সে নিঃশব্দে গৃহকর্ম সম্পন্ন করার জন্যে একটা কঙ্কন হাতে রেখে বাকিগুলো খুলে রেখে দিল। ঠিক তেমনই সাধন-ভজন যতটা সম্ভব একাকী নিঃশব্দে করা যায় ততটাই ভালো।

একবিংশ গুরু : শর নির্মাতা (শবর)। শবর যখন শর নির্মাণ করেন, তখন একাগ্র মনে করেন। গণ্যমান্য ব্যক্তি পাশ দিয়ে চলে গেলেও মনোযোগের চ্যুতি ঘটে না। এইভাবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব।

দ্বাবিংশ গুরু : সর্প। সাপ এখানে-ওখানে এর-ওর গর্তে বাস করে। অর্থাৎ নিজস্ব কোনও বাসস্থান নেই। মায়ায় বদ্ধ হওয়ার কারণে সাধকেরও কোনও নিজস্ব স্থায়ী বাসস্থান থাকা উচিত নয়।

ত্রয়োবিংশ গুরু : মাকড়সা। নিজের দেহসঞ্জাত লালা দিয়ে নিজের বোনা জালে মাকড়সা কিন্তু জড়িয়ে পড়ে না। সেই জালে ধরা পড়ে অন্য কীটপতঙ্গ। সাধকের বোঝা প্রয়োজন ঈশ্বরসৃষ্ট ভাঙা-গড়ার বিশ্ব সংসারে তিনি যেন জড়িয়ে না পড়েন।

চতুর্বিংশ গুরু : কাচ পোকা। কাচ পোকার আশ্রিত অন্যান্য পোকাও কাচপোকার আকার ধারণ করে। সাধকও যদি তন্ময় হয়ে ভগবানের চিন্তা করেন তাহলে তিনিও ভগবানের স্বরূপ (জানতে) লাভ করতে পারবেন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন– আমাদের পূর্বপুরুষ যদুরাজা ছিলেন পরমধার্মিক। তিনি একজন অবধূতের কাছে যা শিক্ষালাভ করেছিলেন মোটামুটি সেগুলিই এখানে আলোচিত হল। ❑

প্রকৃতির অমোঘ বিধানে
নির্মম সত্যকে বরণ করে
যাঁরা চলে গেছেন অজানা স্থানে
যাঁদের স্মৃতি ও কীর্তি
আমাদের অনুভূতিকে আজও
স্পন্দন জাগায়
তাঁদের স্মরণে।

বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু কালচারাল সোসাইটি ও
বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির
টরেন্টো

ভুতুড়ে কণার কীর্তি আবিষ্কার ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্যের নতুন আশা

সুজয় চক্রবর্তী

আস্ত একটা 'হাতি'কে নাড়িয়ে দিল একটা 'মশা'! নড়িয়ে দিল। থরথর করে কাঁপিয়ে দিল। সরিয়ে দিল। কোনও মাহুত না হলেও, এই প্রথম দেখা গেল, সেই মশাই 'হস্তীরে নড়ান, হস্তীরে চরান'। যা মিলিয়ে দিল ৪৩ বছর আগেকার এক বিজ্ঞানীর পূর্বাভাস। এটুকু পড়ে বলতেই পারেন, 'বলেন কি মশাই?' জবাবটা হল- হ্যাঁ, মশা-ই!

মশাটা এই ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা। যার নাম নিউট্রিনো। যার আরও একটি নাম রয়েছে, 'ভুতুড়ে কণা'। আর সেই হাতিটা অবশ্য আমাদের চেনা, জানা হাতি নয়। সেই হাতি আসলে একটি পদার্থের পরমাণুর 'হৃদয়' নিউক্লিয়াস। তবে 'হাতি' নিউক্লিয়াসের কাছে সেই নিউট্রিনো বা ভুতুড়ে কণা আসলে মশারই সমান।

নিউট্রিনো বা ভুতুড়ে কণাদের এই বিচিত্র কেরামতি দেখে তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। টগবগ করে ফুটতে শুরু করে দিয়েছেন উৎসাহে। তাঁদের আশা, মশার হাতি নাড়ানোর পথ ধরে একদিন পৌঁছে যাওয়া যাবে বিগ ব্যাং বা সেই মহা বিস্ফোরণের ঠিক পরের সময়ে। সেই বিস্ফোরণের ঠিক পরের ৪ লক্ষ বছরে কী কী ঘটেছিল, তা তো এখনও রয়েছে পুরোপুরি অন্ধকারে।

> এই পরমাণুর নিউক্লিয়াসকেই সরাতে, নড়াতে, দোলাতে পেরেছে নিউট্রিনোরা। এ বার আমরা দেখব, আরও দুটি মৌলিক পদার্থ জেনন ও জার্মেনিয়ামের পরমাণুর নিউক্লিয়াসকেও লো এনার্জির নিউট্রিনোরা নাড়াতে পারে কি না।"

সেই অজানা কাহিনী কেন জানতে পারিনি?

অতীত বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানতে পারি, জানতে পেরেছি এত দিন, সে সবই ওই আলোর সূত্র ধরে। আলোর কণা 'ফোটন'-এর হাত ধরে, তারই দেখানো পথে। ফোটনই তো এই ব্রহ্মাণ্ডকে চেনা-জানার এক ও একমাত্র 'হাতিয়ার' হয়েছে এত দিন। হয়ে চলেছে। ব্রহ্মাণ্ডের 'ওয়ান অ্যান্ড ওনলি টর্চ বেয়ারার'। বিগ ব্যাং-এর পরপরই জন্ম হয়েছিল আলোর কণা ফোটনের। কিন্তু সেই ফোনটগুলি তখন নিজেদের মধ্যে ঘুষোঘুষি, খুনসুটি (স্ক্যাটারিং) করতেই ব্যস্ত ছিল। বিগ ব্যাং-এর পরের ৪ লক্ষ বছর পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে সেই ঘুষোঘুষি, খুনসুটিতে মেতে থাকার ফলে ফোটনগুলি বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ছড়িয়ে, ছিটিয়ে পড়তে পারেনি। ফলে, সেই ফোটনগুলি আমাদের সামনে টর্চের আলো ফেলতে পারেনি। তাই বিগ ব্যাং-এর পরের ৪ লক্ষ বছরে ঠিক কী কী ঘটনা ঘটেছিল, তা আমরা আজও জানতে পারিনি।

ভুতুড়ে কণারা কী জিনিস? বোঝাচ্ছেন বিশিষ্ট কণা পদার্থবিজ্ঞানী ডন লিঙ্কন। দেখুন ভিডিও। সৌজন্যে : ফের্মিল্যাব।

আর যারা সেই অজানা ঘটনাবলি জানতে পারতো, তারা এই ভুতুড়ে কণা বা নিউট্রিনো। কারণ তারাও ফোটনের সঙ্গেই জন্মেছিল বিগ ব্যাং বা সেই মহা বিস্ফোরণের পরপরই। ফোটনরা বেরিয়ে আসতে না পারলেও বোধহয় প্রায় 'অশরীরী' বলেই ভুতুড়ে কণারা কিন্তু বেরিয়ে আসতে পেরেছিল বিগ ব্যাং-এর পরেই। হু হু করে চার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে শুরু করেছিল। ছুটতে শুরু করেছিল উদ্দাম গতিতে। প্রায় আলোর কণা ফোটনের গতিবেগেই। এই ব্রহ্মাণ্ডে চলার পথে কোনও কণা, কোনও মহাজাগতিক বস্তুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি নিউট্রিনোদের সামনে। তবে তারা যে আবার প্রায় 'অশরীরী'! তাই ভুতুড়ে কণারদের ওপরেও এত দিন সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের গোপন রহস্যের জাল কাটার ব্যাপারে ততটা ভরসা করা যাচ্ছিল না। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ বার ভুতুড়ে কণাদের এই বিচিত্র কেরামতি সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের গোপন রহস্যের জাল কেটে দিতে পারে এক দিন। জানা যেতে পারে সেই মহাবিস্ফোরণের পর কী কী ঘটনা ঘটেছিল। কারা কারা জন্মেছিল। জন্মানোর পর তারা কী করছিল। জানা যেতে পারে সেই মহা বিস্ফোরণের পিছনে কার হাত ছিল। কার 'ইচ্ছা'য় ঘটেছিল ওই প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণ ঠিক কীভাবে বীজ পুঁতেছিল এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির উন্মাদনার। তাই একটা হালকা, পাতলা ভুতুড়ে কণা (খুব বেশি হলে, ইলেকট্রনের ভরের ৫ লক্ষ ভাগের মাত্র ১ ভাগ) শেষমেশ আস্ত একটা হাতিকে নাড়িয়ে দেওয়ার এই যে কেরামতি দেখাল, তা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে হয়ে গেল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। গত সাড়ে ৪ দশক ধরে যে ঘটনাচাক্ষুষ করার জন্য হাপিত্যেশ অপেক্ষায় ছিলেন বিশ্বের তাবৎ বিজ্ঞানীরা।

কোনও গল্পকথা নয়। নয় কোনও কল্পকাহিনীও। প্রায় অশরীরী ভুতুড়ে কণার এই কেরামতির কথা হালে প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জার্তিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'সায়েন্স'-এ। গত ৩ আগস্ট সংখ্যায়। একটি আন্তর্জাতিক গবেষকদলের ওই গবেষণা পত্রটির শিরোনাম– 'অবজারভেশন অব কোহেরেন্ট ইল্যাস্টিক নিউট্রিনো-নিউক্লিয়াস স্ক্যাটারিং'। মূল গবেষক মস্কোর ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টারের ইনস্টিটিউপ ফর থিয়োরেটিক্যাল অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্সের অধ্যাপক দিমিত্রি আকিমভ। গবেষকদের অন্যতম বিশিষ্ট কণাপদার্থবিজ্ঞানী জে আই কোলার

সেই ভুতুড়ে কণা, নিউট্রিনো– ফাইল চিত্র।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনরিকো ফের্মি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক। ভুতুড়ে কণাদের এই বিচিত্র কেরামতি চাক্ষুষ করতে গবেষকরা বানিয়ে ফেলেছেন বিশ্বের ক্ষুদ্রতম নিউট্রিনো সন্ধানী যন্ত্র বা নিউট্রিনো ডিটেক্টর। যার ওজন সাকুল্যে সাড়ে ১৪ কিলোগ্রাম বা ৩২ পাউন্ড। যা লম্বায় ৪ ইঞ্চি, চওড়ায় ১৩ ইঞ্চি।

ভারতে নিউট্রিনো গবেষণার পথিকৃৎ বিজ্ঞানী, কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের (এসআইএনপি) রাজা রামান্না ডিসটিঙ্গুইজ্ড ফেলো অধ্যাপক নবকুমার মণ্ডলের কথায়, "সে কাউকেই পরোয়া করে না বলে। কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে চায় না বলে। কথা বলতে চায় না বলে। মোদ্দা কথায়, এই ব্রহ্মাণ্ডের যেন কারও সঙ্গেই ইন্টারঅ্যাকশনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই ভুতুড়ে কণাদের।"

স্ট্রং ফোর্স বা শক্তিশালী বল তো দূরের কথা, তড়িৎ-চৌম্বকীয় বল বা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফোর্সের সঙ্গেও কখনও কোনও বনিবনা হয় না এই ভুতুড়ে কণাদের। তাদের বনিবনা হয় শুধুই খুব দুর্বল মহাকর্ষীয় বল বা গ্রাভিটেশনাল ফোর্স আর অত্যন্ত অল্প পাল্লার উইক ফোর্স (যে বলে বাঁধা থাকে বলেই তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু ভেঙে যায়) বা দুর্বল বলের সঙ্গে। মুম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের (টিআইএফআর) অধ্যাপক অমল দিঘের কথায়, "কোনও কণা বা মহাজাগতিক বস্তুর সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন করাটা তাদের স্বভাবে নেই বলে এই ভুতুড়ে কণারা সব কিছুর মধ্যে দিয়েই অনায়াসে গলে যায়। তাদের ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। তাই এদের হদিশ পেতে বহু ঘাম ঝরাতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের।"

নবকুমারবাবুর বক্তব্য, এরা এতটাই ভুতুড়ে যে, প্রতি মুহূর্তে আমাদের শরীরের ১ বর্গ সেন্টিমিটারে এসে ঢুকছে ১ লক্ষ কোটি নিউট্রিনো। শরীর ফুঁড়ে সেগুলি বেরিয়েও যাচ্ছে। আমরা টেরও পাচ্ছি না। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই প্রতি ১ ঘন সেন্টিমিটারে থাকে ৪৩০ টি ফোটন। আর নিউট্রিনো কণা থাকে ৩১০ টি। নিউট্রিনোরা আদতে ইলেকট্রনের মতোই মৌল কণা। তাদের আর ভাঙা যায় না। তবে ইলেকট্রনের যেমন আধান (চার্জ) রয়েছে, এদের তা নেই। নিউট্রিনোরা একেবারে শ্রীনিরপেক্ষ! '৬০-এর দশকের শেষাশেষি প্রথম জানা যায়, এরা তিন ধরনের হয়। মানে, তাদের তিন ধরনের 'ফ্লেভার' থাকে। ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউওন নিউট্রিনো আর টাওন নিউট্রিনো। এও জানা গিয়েছে, ব্রহ্মাণ্ডে নিজেদের যাত্রাপথে এরা 'বহুরূপী' হয়। এক রূপ থেকে ঘন ঘন বদলে যায় অন্য রূপে। ইলেকট্রন নিউট্রিনো বদলে যায় মিউওন নিউট্রিনো বা টাওন নিউট্রিনোয়। আর '৯৮ সালে প্রথম জানা যায়, এদের ভরও রয়েছে খুব সামান্যই। তবে তা কত, এখনও ঠিকঠাক ভাবে তা জানা সম্ভব হয়নি।

অতলান্ত ব্রহ্মাণ্ড সাঁতরাতে গিয়ে যেভাবে রং, রূপ (ফ্লেভার) বদলায় 'বহুরূপী' ভুতুড়ে কণারা।

ভুতুড়ে কণাদের বিচিত্র কেরামতি চাক্ষুষ করতে কেন লাগল সাড়ে ৪ দশক?

একটা গল্প বলা যাক। মনে করুন, একটা ক্যাফেটারিয়া। তার ভেতরে চা, কফি, পকোড়া নিয়ে এখানে ওখানে জটলা। সেই ক্যাফেটারিয়ার একটা দরজা দিয়ে হুশ করে ঢুকে একটা লোক

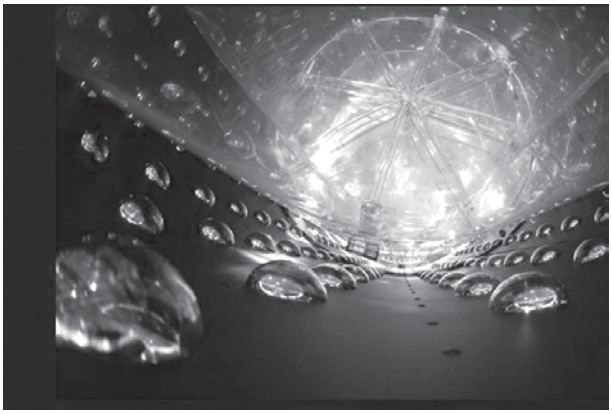

ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া সেই ভুতুড়ে কণারা। শিল্পীর কল্পনায়।
পৃথিবীতে এক দিন আর কোনও গ্রহণই হবে না!
'ঈশ্বরের মন' পড়তে পেরেছিলেন আইনস্টাইন!

অন্য দরজা দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে গেল চোখের নিমেষে। কোনও জটলার কারও সঙ্গে কথা বলল না। কোথাও দু'দণ্ড দাঁড়াল না। সবাই গল্পে মজে রয়েছে বলে কোনও জটলারই কেউ তাকে খেয়ালও করতে পারল না। এই নিউট্রিনোরাও তেমনই ব্রহ্মাণ্ডে প্রায় কারও সঙ্গেই তেমন 'গল্প' করতে চায় না বলে নিউট্রিনোদের দেখা বা তাদের বিচিত্র কেরামতি চাক্ষুষ করাটা খুব দুরূহ হয়ে পড়ে। তবু ১৯৫৬ সালে প্রথম এরা ধরা দিয়েছিল বিজ্ঞানীদের কাছে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকা কয়েকটি প্রোটন বা নিউট্রনকে ধাক্কা মেরে ছিটকে দিয়েই প্রথম ধরা পড়েছিল এই ভুতুড়ে কণারা। কিন্তু আস্ত একটা ভারী নিউক্লিয়াসকেই যে ধাক্কা মেরে সরাতে পারে, ভুতুড়ে কণাদের সেই বিচিত্র কেরামতি এত দিন চাক্ষুষ করা সম্ভব হয়নি বিজ্ঞানীদের।

মূল গবেষক দিমিত্রি আকিমভ (বাঁ দিকে)। ভারতে নিউট্রিনো গবেষণার পথিকৃৎ বিজ্ঞানী নবকুমার মণ্ডল (ডান দিকে ও পরে) এবং টিআইএফআরের অধ্যাপক অমল দিঘে।

ওজন আধুলির মতো ঃ পৃথিবীকে পাক মারছে ৬ মহাকাশযান

অধ্যাপক নবকুমার মণ্ডল জানাচ্ছেন, এই নিউট্রিনোরা আসলে লো এনার্জির ভুতুড়ে কণা। তারা প্রায় অশরীরী বলে অসম্ভব রকমের হালকা, পলকা তো বটেই, তাদের দমও খুব কম। শক্তি কম। ফলে, তারা যখন তাদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ ভারী নিউক্লিয়াসকে ধাক্কা মারে, তখন সেই ধাক্কা ততটা জোরালো হতে পারে না যাতে নিউক্লিয়াসটা যে সরছে বা দুলছে, তা সহজে বোঝা যায়। যে ধাক্কা মারছে তার কিছুটা শক্তি তো যাকে ধাক্কা মারছে, তার কাছে চলে যাবেই। তখন যে ধাক্কা খেল, সে ওই অল্প শক্তিতে নড়ে, দুলে ওঠে। তার নিজের জায়গা থেকে একটু সরে যায়। এবার সেইটা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই প্রথম হাতে কলমে প্রমাণ পেলেন, প্রায় অশরীরী ভুতুড়ে কণারা হাতির চেহারার মতো বিশাল নিউক্লিয়াসকেও নাড়িয়ে দিতে পারে, তার জায়গা থেকে সরিয়ে দিতে পারে।

ভুতুড়ে কণা আর ইলেকট্রনের মতো লেপটন কণাদের ফারাকটা কোথায়? দেখুন অ্যানিমেশন ভিডিও।

অধ্যাপক অমল দিঘের বক্তব্য, যেহেতু লো এনার্জির নিউট্রিনোদের দেওয়া ধাক্কাটা ততটা জোরালো নয়, তাই তাদের ধাক্কায় পরমাণুর ভারী নিউক্লিয়াসটা এতটাই সামান্য নড়ে বা সরে যে, তাকে চাক্ষুষ করতে গেলে যে ডিটেক্টর লাগে, তার সেনসেটিভিটি অনেক অনেক গুণ বাড়ানোর দরকার হয়। সেটা এত দিন আমাদের হাতে ছিল না বলেই ভুতুড়ে কণাদের এই বিচিত্র কেরামতি চাক্ষুষ করতে লেগে গেল প্রায় সাড়ে ৪ দশক। এবার গবেষকরা সেই ডিটেক্টরের সেনসেটিভিটি তো অনেক অনেক গুণ বাড়িয়েছেনই, সেই যন্ত্রকে কিছুটা পোর্টেবলও করে ফেলেছেন।

আবার সেই ক্যাফেটারিয়ার গল্পে ফিরি। যে লোকটা হুশ করে ঢুকে নিঃসাড়ে হুশ করে বেরিয়ে গেল ক্যাফেটারিয়ার অন্য দরজা দিয়ে, সে তো ক্যাফেটারিয়ার ভেতরে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জটলাগুলোর ভিড়ে মিশে গিয়ে দু'দণ্ড কথা বলার ফুরসৎই পাবে না। তার তো খুব তাড়া। তাড়ার চোটে সে বড়জোর জটলার দু-একজনকে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে যাবে। তারা ধাক্কায় কেউ জটলা থেকে সামান্য ছিটকেও যেতে পারে। কিন্তু যে লোকটার দম কম, তাড়া কম, সে ক্যাফেটারিয়ায় পছন্দ মতো কোনও জটলায় গিয়ে গল্পে মশগুল হওয়ার সুযোগটা বেশি পাবে। সময়ও বেশি পাবে। সময়টা তার হাতে একটু বেশি বলে সে জটলার মধ্যে ঢুকে সবার সঙ্গেই ভাব জমাতে চাইবে। গোটা জটলাটাকেই নাড়াবে, জমাবে!

এবার সেই ঘটনাই ঘটেছে।

নবকুমার বাবু বলছেন, "বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, লো এনার্জির নিউট্রিনোদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটেছে। এত দিন বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, লো এনার্জির নিউট্রিনোরা শুধুই তাদের চলার পথে পড়া নিউক্লিয়াসের কয়েকটা প্রোটন, নিউট্রনকে ধাক্কা মেরে ছিটকে দিতে পারে। এবার দেখা গেল, শুধু তাই নয়। লো এনার্জির ভুতুড়ে কণারা গোটা হাতিটাকেই, মানে পরমাণুর নিউক্লিয়াসটাকেই সরিয়ে দেয় কিছুটা। নড়িয়ে দেয়, দুলিয়ে দেয়।"

নবকুমারবাবু ও অমল দিঘের বক্তব্য, যেটা আরও তাৎপর্যের, তা হল, এ বার এটাও দেখা গিয়েছে, পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ধাক্কা মেরে তার ভেতর থেকে প্রোটন, নিউট্রনকে ছিটকে বের করে দেওয়ার যতটা সম্ভাবনা, লো এনার্জির ভুতুড়ে কণা বা নিউট্রিনোদের ধাক্কায় নিউক্লিয়াসের দুলে ওঠা বা সরে যাওয়ার সম্ভাবনা তার চেয়ে ১০ থেকে ১০০ গুণ বেশি। আনন্দবাজারের পাঠানো প্রশ্নের জবাবে মূল গবেষক, মস্কোর ন্যাশনাল রিসার্চ

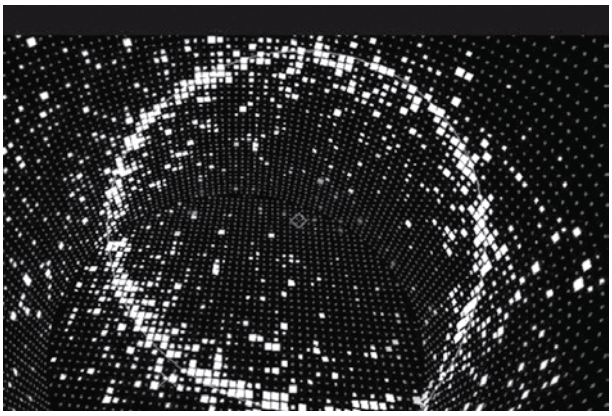

সেই ভুতুড়ে কণারা– কম্পিউটার সিম্যুলেশন।

সেন্টারের ইনস্টিটিউট ফর থিয়োরেটিক্যাল অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্সের অধ্যাপক দিমিত্রি আকিমভ ই-মেলে লিখেছেন, "দুটি মৌলিক পদার্থ সিজিয়াম ও আয়োডিনের একটি যৌগ সিজিয়াম আয়োডাইডের পরমাণু নিয়ে আমরা পরীক্ষাটা চালিয়েছি। এই পরমাণুর নিউক্লিয়াসকেই সরাতে, নড়াতে, দোলাতে পেরেছে নিউট্রিনোরা। এ বার আমরা দেখব, আরও দুটি মৌলিক পদার্থ জেনন ও জার্মেনিয়ামের পরমাণুর নিউক্লিয়াসকেও লো এনার্জির নিউট্রিনোরা নাড়াতে পারে কি না।"

নবকুমারবাবুর বক্তব্য, এর ফলে তিনটি সম্ভাবনার দরজা খুলে গেল। এক, এর ফলে কোন্ কোন্ কণাগুলি ডার্ক ম্যাটার, তার

(পরবর্তী অংশ ১৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামীজীর শেষবেলা

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা। গুরু-শিষ্যের এক অসামান্য সম্পর্ক। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার পর মার্গারেট নোবেল আক্ষরিক অর্থেই তাঁর পরবর্তী সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ভারত ও ভারতবাসীর সেবায়। আইরিশ খাপ খোলা তলোয়ারের মতো তেজস্বিনী এক নারীকে স্বামীজী কী মন্ত্রে আদ্যন্ত ভারতীয়ায় রূপান্তরিত করলেন, তার থই আজও পাওয়া যায় না।

স্বামীজীর শেষ জীবনে, যখন তার শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়ছে, নিবেদিতা ছায়ার মতো তাঁর অনুগামী। ১৮৯৮ সালে স্বামীজীর সঙ্গের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় ধরা আছে নিবেদিতার 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে। ওই বছরই স্বামীজীর শেষবারের মতো হিমালয়ে যাওয়া। শৈবতীর্থ অমরনাথে শিবের কাছে স্বামীজী ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছিলেন। গুহা থেকে বেরিয়ে প্রিয়া শিষ্যাকেই তিনি প্রথম সে কথা জানান। স্বামীজীর মর্ত্যজীবনের এই পরম প্রার্থনাটির কথা জেনে বিস্মিত হন নিবেদিতা। আরও বিস্মিত হন স্বামীজী যখন বলেন, তাঁর এবার হিমালয়ে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য শিবসুন্দরের কাছেই নিবেদিতাকে উৎসর্গ করা তাঁর জীবনব্রত উদ্‌যাপনের জন্য। আমরা জানি, হিমালয় তীর্থে সেই দুটি প্রার্থনাই পূরণ হয়েছিল বিবেকানন্দ ও তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতার জীবনে।

চিঠির অক্ষরগুলি যেন চোখের সামনে কাঁপছে নিবেদিতার, সঙ্গে শরীরটাও। ঘরে উপস্থিত নিবেদিতার সেবিকাও কেঁদে উঠলেন। মাত্র দু'দিন আগেই তো নিবেদিতা বেলুড় মঠে গিয়েছিল স্বামীজীরই নিমন্ত্রণে। স্বামীজী তাঁদের খাইয়েছিলেন পরম যত্নে।

১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামীজীর সেই প্রথম ইচ্ছাপূরণের দিনটি এল। সে দিন শুক্রবার। বেলুড় মঠে সন্ধ্যায় মন্দিরের প্রার্থনার সময় স্বামীজী তাঁর নিজের ঘরে ধ্যানাসনে বসে রাত ৯টায় শান্তভাবে মহাসমাধি লাভ করেন। সেই অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যকান্তি মুখমণ্ডল দেখে প্রথমে কেউ বুঝতেই পারেননি যে, এ স্বামীজীর অমৃতধামযাত্রা তথা দু'বছর আগে হিমালয়তীর্থ অমরনাথধামে তুষারলিঙ্গ মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁর ইচ্ছামৃত্যু প্রার্থনার 'প্র্যাক্টিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন'। কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য হলেও তাঁর জীবনব্রত উদ্‌যাপনের জন্য যাঁদের রেখে গেলেন, এর পর তাঁদের কী হবে বা হল? এবার সে কথাই।

পরদিন ৫ জুলাই, শনিবার। তখন ভগিনী নিবেদিতার ঠিকানা ১৬ নম্বর বাগবাজার লেন। সকাল ৯টা নাগাদ বেলুড় মঠ থেকে একটা ছোট চিঠি পান স্বামী সারদানন্দজী স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বয়ানে– "মাই ডিয়ার নিবেদিতা, দ্য এন্ড হ্যাজ কাম, স্বামীজী হ্যাজ স্লেপ্ট লাস্ট নাইট অ্যাট নাইন ও' ক্লক। নেভার টু রাইজ এগেন সারদানন্দ"।

চিঠির অক্ষরগুলি যেন চোখের সামনে কাঁপছে নিবেদিতার, সঙ্গে শরীরটাও। ঘরে উপস্থিত নিবেদিতার সেবিকাও কেঁদে উঠলেন। মাত্র দু'দিন আগেই তো নিবেদিতা বেলুড় মঠে গিয়েছিল স্বামীজীরই নিমন্ত্রণে। স্বামীজী তাঁদের খাইয়েছিলেন পরম যত্নে এবং আহার শেষে স্বামীজী অতিথিদের হাতে জল ঢেলে দিয়েছিলেন হাত ধোয়ার জন্য। নিবেদিতা সঙ্কুচিত হয়েছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, "যিশু তো শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।" কিন্তু সে তো শেষের দিনে। তখন নিবেদিতা ভাবতেও পারেননি, তাঁর গুরুর ক্ষেত্রেও এই কথাটা আক্ষরিক অর্থেই মিলে যাবে। স্বামীজী কিন্তু অমরনাথে নিবেদিতাকে আভাস দিয়েই রেখেছিলেন, মহাদেব-কৃপায় তিনি ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছেন। যার নিহিত অর্থ হল, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হলে তাঁর দেহত্যাগ হবে না। স্বামীজীর মহাসমাধির পূর্ব পর্যন্ত আনুপূর্বিক সব কথা শুনে নিবেদিতার সেই সব কথাই মনে পড়ছিল। এক দিকে নিবেদিতার শোকস্তব্ধ উদ্গত নয়নের অশ্রুধারা, আর একদিকে এইসব স্মৃতি। নিবেদিতা আর কালবিলম্ব না করেই বেলুড় থেকে আসা পত্রবাহকের সঙ্গেই রওনা হলেন বেলুর মঠ অভিমুখে। ইতিমধ্যে স্বামীজীর প্রয়াণের খরব ছড়িয়ে গিয়েছে সারা শহরে। সবাই ছুটছে সেই বেলুড়ের দিকে। বেলুড় মঠে পৌঁছেই নিবেদিতা সোজা উঠে গেলেন দোতলায় স্বামীজীর ঘরের দিকে। ঘরে তখন বেশি লোকজন নেই। স্বামীজীর দেহটি মেঝেতে শায়িত হলুদ রঙের ফুলমালা আচ্ছাদিত হয়ে। মানসকন্যা স্বামীজীর শিয়রের কাছে বসে পড়েন। নয়নে অবিরল অশ্রুধারা, মুখে কোনও কথা নেই। আবেগ-আকুল কম্পিত হাতে তুলে নেন গতপ্রাণ স্বামীজীর মাথাটি। এখন আর তিনি কন্যা নন, তিনি মাতা। স্বামীজীর তাঁর প্রতি আশীর্বচনের সার্থক রূপ একাধারে তিনি সেবিকা ও মাতা। যেন মায়ের মতোই প্রিয়বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হয়ে সেই অনিন্দ্যসুন্দর শিবরূপী গুরুর সেবা করতে থাকেন ছোট একটি পাখা হাতে। এর পর সেই মহাযাত্রার পালা। একে একে সন্ন্যাসী-ভাইরা এসে স্বামীজীর দেহটি নীচে নামিয়ে আনেন। আরতি ও প্রণাম-শেষে পা দু'টি অলক্তরাগে রঞ্জিত করেন ও মস্তক অবলুণ্ঠিত করে প্রণাম করেন। গুরুভাইরা শ্রীপাদপদ্মের ছাপ নেন। নিবেদিতাও অশ্রুসিক্ত নয়নে পা দুটি ধুয়ে একটি পরিষ্কার রেশমি রুমালে তাঁর গুরুর পদচিহ্ন গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী ও সমবেত জনতার সঙ্গে নিবেদিতাও চলেন পায়ে পায়ে সেই গতপ্রাণ বিজয়ী বীরের দেহটি নিয়ে মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে। স্বামীজীর শেষকৃত্য সমাপনের নির্দিষ্ট স্থানে, যে স্থান বিবেকানন্দ নিজেই চিহ্নিত করেছিলেন মহাপ্রয়াণের কিছু দিন আগে, তাঁর প্রিয় বেলগাছের তলে অপেক্ষাকৃত ঢালু জায়গায়।

দেহটি নামানো হলে নিবেদিতা সেই গাছেরই একটু দূরে এসে বসে পড়েন। চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করেন প্রথমে নিবেদিতা ও পরে একে একে গুরুভাই ও অন্যান্য সন্ন্যাসী-ভাইয়েরা। প্রজ্বলিত চিতাগ্নির সামনে বিবেকানন্দের প্রিয় 'জি.সি' অর্থাৎ নাট্যকার ও মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বিলাপ, "নরেন, তুমি তো ঠাকুরের ছেলে, ঠাকুরের কোলে গিয়ে উঠলে। আর আমি বুড়ো মানুষ, কোথায় তোমার আগে যাব, তা না হয়ে আজ আমাকে দেখতে হচ্ছে তোমার এই দৃশ্য।" এ কথা শোনামাত্র নিবেদিতা শোক চেপে রাখতে না পেরে দাঁড়িয়ে উঠে স্বামীজীর প্রজ্বলিত চিতাগ্নির পাশে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। এ দৃশ্যে বিচলিত স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর স্বামীজীর শিষ্য নিশ্চলানন্দকে নিবেদিতাকে চিতাগ্নির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে বলেন।

সারা অঙ্গ চন্দনচর্চিত মনুষ্যদেহে তাঁর শিবরূপী গুরুর ধূপধুনো-গুগগুল সুবাসিত চিতাগ্নি তথা হোমাগ্নি নিবেদিতার অনর্গল নয়নধারায় বুঝি নির্বাপিত করতে চান। সেই হৃদয় হাহাকার করা মুহূর্তে সহসা গুরুর এক অলৌকিক স্নেহস্পর্শ নিবেদিতাকে চমকিত করে। চিতাগ্নি থেকে একখণ্ড গেরুয়া বস্ত্র হাওয়ায় উড়ে এসে নিবেদিতার কোলে গিয়ে পড়ে। পরম মমতায় ও যত্নে নিবেদিতা তা গুরুর আশীর্বাদ ভেবে মাথায় ঠেকান। সেই পবিত্র স্পর্শ যেন শোকস্তব্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনা ও শক্তি জোগায়। তবু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন "পরের জন্য নিজেকে যিনি বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁকেও কেন ছেড়ে দিতে হয় আমাদের? হে ভগবান, কেন?"

এরপর নিবেদিতার বাকি জীবন যেন অগ্নিশিখাই। মানব-সেবার পুণ্যব্রতে। ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ি থেকে নিবেদিতার সংগ্রাম আর এক ইতিহাস। তার সবটুকুই গুরু বিবেকানন্দের দেখানো পথে। ❑

(রীতিনীতি-আচরণে দুর্গাপূজার সেকাল ও একাল– ১৩৫ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

একালে বিসর্জনের ছবিটা একটু নয় অনেকটা আলাদা। বর্তমানের বনেদি বাড়িতে পুরনো ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে তার সমারোহ হয় সামান্য নিয়মরক্ষার মতো। যাঁরা বাড়ির লোক আত্মীয় তাদের জন্যে লুচি আর মোহনভোগ রাখা হ'ত। তবে তা খুবই সামান্য। এখন দুর্গানাম লেখা হয় সাদা কাগজে। তাও বারোয়ারি পূজায় এসব কিছুই হয় না। অবশ্যই পাড়ার বউ-ঝিরা এসে বরণ বা কনকাঞ্জলির ব্যবস্থা করেন, তবে তাতে প্রাণের ছোঁয়ার থেকেও কর্তব্য আর সংস্কার মিশে থাকে। থিমের পূজায় আর্টের সমারোহ। কিন্তু প্রতিমার দিকে তাকিয়ে মন আনচান করে না। বিসর্জনের পর মাকে বিসর্জন না দেওয়া মানে পূজার অঙ্গহানি। কিন্তু এখন তাই ঘটছে। দিনের পর দিন প্রতিমা পড়ে থাকছেন প্যান্ডেলে। নিয়মরক্ষে মতো হয়তো প্রদীপ জ্বালা আরতি ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তা করেন কোনও ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত। তবে বিসর্জনের ঘটা এখন কিছু কম নয়। বড় বড় আলো দিয়ে জেনারেটার দিয়ে নানারকম ব্যান্ডের বাজনা দিয়ে বিসর্জন যাত্রা করা হয়— কিন্তু শব্দবাজি আর নাচ দর্শনীয় হয়ে ওঠে, মন কাড়ে না।

বিজয়ার পর প্রণাম প্রায় নেই বললেই চলে। সময়ের অভাব, ইচ্ছার অভাব, ব্যস্ততার অজুহাতে ফোনেই সব সারা হয়। কেউ কারও বাড়ি মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছে এমন উদাহরণ কম। কারণ সেই আন্তরিকতাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সবাই মিলেমিশে থাকার সেই আনন্দটাই আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

অবশ্যই অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে, তবে তা সংখ্যায় খুবই কম। ❑

বেদ রহস্য

অরবিন্দ

বেদসংহিতা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সভ্যতা ও অধ্যাত্মজ্ঞানের সনাতন উৎস। কিন্তু এই উৎসের মূল অগম্য পর্ব্বতের গুহায় নিলীন, তাহার প্রথম স্রোতও অতি প্রাচীন ঘনকণ্টকময় অরণ্যে পুষ্পিত বৃক্ষলতা ও গুল্মের বিচিত্র (আবরণে) আবৃত। বেদ রহস্যময়। ভাষা, কথার ভঙ্গী, চিন্তার গতি অন্য যুগের সৃষ্টি, অন্য ধরনের মনুষ্যবুদ্ধিসম্ভূত। এক পক্ষে অতি সরল, যেন নির্ম্মল সবেগ পর্ব্বতনদীর প্রবাহ, অথচ এই চিন্তাপ্রণালী আমাদের এমনই জটিল বোধ হয়, এই ভাষার অর্থ এমনই সন্দিগ্ধ যে মূল চিন্তা ও ছত্রে ছত্রে ব্যবহৃত সামান্য কথাও লইয়া প্রাচীনকাল হইতে তর্ক ও মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। পরম পণ্ডিত সায়নাচার্য্যের টীকা পড়িয়া মনে এই ধারণা উৎপন্ন হয় যে বেদের কখনই কোনও সংলগ্ন অর্থ ছিল না, নয় যাহা ছিল তাহা বেদের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণরচনার অনেক আগে সর্ব্বগ্রাসী কালের অতল বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল।

সায়ন বেদের অর্থ করিতে গিয়া মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। যেন (কেহ) এই ঘোর অন্ধকারে মিথ্যা আলোকের পিছনে দাঁড়াইয়া বার বার আছাড় খায়, গর্ত্তে পঙ্কে ময়লা জলে পড়ে, হয়রান হইয়া যায়, অথচ ছাড়িতেও পারে না। আর্য্যধর্ম্মের আসল পুস্তক, অর্থ করিতেই হয়, কিন্তু এমন হেঁয়ালির কথা, এমন রহস্যময় নানা নিগূঢ় চিন্তার জড়িত সংশ্লেষণ যে সহস্র স্থলে অর্থই করা হয় না, যেখানে কোনও রকমেই অর্থ হয় সেখানেও প্রায়ই সন্দেহের ছায়া আসিয়া পড়ে। এই সঙ্কটে অনেকবার সায়ন নিরাশ হইয়া ঋষিদের মুখে এমন ব্যাকরণের বিরোধী ভাষা, এমন কুটিল জড়িত ভগ্ন বাক্যরচনা, এমন বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন চিন্তা আরোপ করিয়াছেন যে তাঁহার টীকা পড়িয়া এই ভাষা ও চিন্তাকে আর্য্য না বলিয়া বর্ব্বরের বা উন্মত্তের প্রলাপ বলিতে প্রবৃত্তি হয়। সায়নের দোষ নাই। প্রাচীন নিরুক্তকার যাস্কও তদ্রূপ বিভ্রাট করিয়াছেন আর যাস্কের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণকারও বেদের সরল অর্থ না পাইয়া কল্পনার সাহায্যে mythopoeic faculty-র আশ্রয়ে দুরূহ ঋক্‌গুলির ব্যাখ্যা করিবার বিফল চেষ্টা করিয়াছেন।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঋক্ বা উপমা কেন, বেদের আসল মর্ম্ম লইয়া অতি প্রাচীনকালেও বিস্তর মতভেদ ছিল। গ্রীসদেশীয় য়ুহেমেরের (Euhemeros) মতে গ্রীকজাতির দেবতারা চিরস্মরণীয় বীর ও রাজা ছিল, কালে অন্য প্রকার কুসংস্কারে ও কবির উদ্দাম কল্পনায় দেবতা বানাইয়া স্বর্গে সিংহাসনারূঢ় করা হইয়াছে।

ঐতিহাসিকেরা এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া নানান কল্পিত ইতিহাসের আড়ম্বরে বেদের সুকৃত সরল অর্থ বিকৃত ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। একটি উদাহরণে এই অর্থবিকৃতির ধরন ও মাত্রা বোঝা যাইবে। পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে অগ্নির নিষ্পেষিত বা ছাপান (গুণ্ঠিত) অবস্থা আর অতি-বিলম্বে তাহার বৃহৎ প্রকাশের কথা আছে। "কুমারং মাতা যুবতিঃ সমুব্ধং গুহা বিভন্তি ন দদাতি পিত্রে।– কমেতং ত্বং যুবতে কুমারং পেষী বিভষি মহিষী ভজান। পূর্বীহি গর্ভঃ শরদো ববর্ধহগশ্যং জাতং যতসূত মাতা।" ইহার অর্থ, "যুবতী মাতা কুমারকে ছাপান রাখিয়া গুহায় অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে নিজ জঠরে বহন করেন, পিতাকে দিতে চান না। হে যুবতী, এই কুমারকে, যাহাকে তুমি সম্পিষ্ট হইয়া অর্থাৎ তোমার সঙ্কুচিত অবস্থায় নিজের ভিতরে বহন কর? মাতা যখন সঙ্কুচিত অবস্থা ছাড়িয়া মহতী হয়, তখন কুমারকে জন্ম দেন। অনেক বৎসর ধরিয়া গর্ভস্থ শিশু বৃদ্ধি পাইয়াছে, যখন মাতা তাহাকে প্রসব করিলেন, তখন তাহাকে দেখিতে পাইলাম।" বেদের ভাষা সর্ব্বত্রই একটু ঘন, সংহত, সারবান, অল্প কথায় বিস্তর অর্থ প্রকট করিতে চায়, ইহা সত্ত্বেও অর্থের সরলতা, চিন্তার সামঞ্জস্যের হানি হয় না। ঐতিহাসিকেরা সূক্তের এই সরল অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, যখন মাতা পেষী তখন কুমারং সমুব্ধং, মাতার সম্পিষ্ট অর্থাৎ সঙ্কুচিত অবস্থায় কুমারেরও নিষ্পিষ্ট অর্থাৎ ছাপান অবস্থা হয়, ঋষির ভাষা ও চিন্তার এই সামঞ্জস্য লক্ষ্য কিম্বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা পেষী দেখিয়া পিশাচী বুঝিলেন, ভাবিলেন কোনও পিশাচী অগ্নি তেজ হরণ করিয়াছে, মহিষী দেখিয়া রাজার মহিষী বুঝিলেন, কুমারং সমুব্ধং দেখিয়া কোনও ব্রাহ্মণকুমার রথের চাকায় নিষ্পেষিত হইয়া মরিয়াছে ইহাই বুঝিলেন। এই অর্থে বেশ একটা লম্বা আখ্যায়িকাও সৃষ্টি হইল। ফলে সোজা ঋকের অর্থ দুরূহ হইয়া গেল, কুমার কে, জননী কে, পিশাচী কে, অগ্নির না ব্রাহ্মণকুমারের গল্প হইতেছে, কে কাহাকে কি বিষয়ে কথা বলিতেছে, সব গণ্ডগোল। সর্ব্বত্রই এইরূপ অত্যাচার, অযথা কল্পনার দৌরাত্ম্যে বেদের প্রাঞ্জল অথচ গভীর অর্থ বিকৃত বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, অন্যত্র যেখানে ভাষা ও চিন্তা একটু জটিল, টীকাকারের কৃপায় দুর্ব্বোধ্যতা ভীষণ অস্পৃশ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঋক্ বা উপমা কেন, বেদের আসল মর্ম্ম লইয়া অতি প্রাচীনকালেও বিস্তর মতভেদ ছিল। গ্রীসদেশীয় য়ুহেমেরের (Euhemeros) মতে গ্রীকজাতির দেবতারা চিরস্মরণীয় বীর ও রাজা ছিল, কালে অন্য প্রকার কুসংস্কারে ও কবির উদ্দাম কল্পনায় দেবতা বানাইয়া স্বর্গে সিংহাসনারূঢ় করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতেও য়ুহেমের-পন্থীর অভাব ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহারা বলিত আসলে অশ্বিদ্বয় দেবতাও নয়, নক্ষত্রও নয়, বিখ্যাত দুইজন রাজা ছিলেন, আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ, তবে যদি মৃত্যুর পরে দেবভাবাপন্ন